মেলা মেশা

তারাপদ রায়

জ্ঞানোদয় ১৬সি, নিমতলা লেন, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশিকা ঃ
রত্না রায়

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীপ্রণবেশ মাইতি

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

রাণু ও মদনকে

লেখকের কথা

এ বইয়ের সব লেখাগুলো এক জাতের নয়। কিছু একেবারে হালের, কিছু বেশ পুরনো। ছাপাও হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাগজে; আনন্দবাজার-যুগান্তর থেকে দেশ-অমৃত, আজকাল-বর্তমান এই রকম নানা জায়গায়।

কিছু রম্যরচনা, কয়েকটি ব্যক্তিগত নিবন্ধ, একটি ভ্রমণ-কাহিনী, আরো দু-চারটি সরস গল্প দিয়ে এই বই, প্রায় সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে তাই এর সোজাসুজি নাম দেওয়া হলো মেলামেশা।

তারাপদ রায়
৩বি, লিটল রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭১

সূচীপত্র

একটি মাছির জন্য

প্রথম গল্পটি আমি শুনেছিলাম এক ভদ্রলোকের কাছে, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজের রয়্যাল এয়ার ফোর্সে ছিলেন। সেই সময় তিনি কিছুদিন অসুস্থ অবস্থায় এয়ার ফোর্সের হাসপাতালে ছিলেন। মাছির ঘটনাটি সেই হাসপাতালেই ঘটেছিল।

ইংরেজদের সামরিক হাসপাতাল মানে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বা আর. জি. কর. নয়। সদা সর্বদা, সর্বত্র ঝকঝক, তকতক করছে। মেঝে এত পরিষ্কার যে সেখানে সিঁদুর পড়লে সে সিঁদুর তুলে নিয়ে সিঁথিতে লাগানো যায়। রোগীদের বেডে কুকুর নেই, বেডের নিচে বেড়াল ছানা নেই, দেয়ালে টিকটিকি পর্যন্ত নেই। কোথাও একটা মশা, একটা মাছির চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

কিন্তু অঘটন ঘটলো একদিন, আর সেদিনই কিনা এয়ার ফোর্সের ভাইস মার্শাল হাসপাতাল দেখতে আসছেন। আমাদের এই গল্পের বক্তা যে বেডে শুয়েছিলেন সেই বেডের পাশের দেয়ালে হঠাৎ একটা মাছি দেখা গেল। অসম্ভব, অকল্পনীয় ব্যাপার। তাছাড়া মাছিটা যদি ভাইস মার্শাল দেখে ফেলেন তাহলে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের মুণ্ডুপাত হবে।

সবাই তটস্থ হয়ে উঠলো। মেম নার্স, সাহেব ডাক্তার, নেপালী জমাদার থেকে মায় কেরানিবাবুরা পর্যন্ত সেই মাছিটাকে ধরার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কেউ চায়ের ছাকনি দিয়ে, কেউ গামছা দিয়ে, কেউ ঝাঁটা দিয়ে যেভাবেই হোক মাছিটাকে, জীবিত অথবা মৃত, ধরার জন্য সবাই আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। মাছিটি এই ধরা পড়ে পড়ে অথচ পড়ে না, শেষ মুহূর্তে ফুরুৎ করে উড়ে যায়। সবাই ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত হতাশ হয়ে পড়লো।

ইতিমধ্যে ভাইস মার্শাল এসে গেছেন। তিনি গটগট করে ঘরের মধ্য দিয়ে গেলেন রোগীদের 'গুড মর্নিং' বলতে বলতে। মাছি দূরের কথা ঘরের মধ্যে একটা কাক থাকলেও তাঁর পক্ষে সেটা নজর করা কঠিন হ'ত। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো সকলের। মাছিটা এসে আবার রোগীর পাশে বসলো।

এই শহরের গত শতকের এক অস্থির কবি, বলা উচিত কলকাতার প্রথম শহুরে কবি আক্ষেপ করে ছন্দময় ভাষায় বলেছিলেন যে, রাতে মশা এবং দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছেন তিনি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত মশা আর মাছিদের মধ্যে রাত এবং দিনের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, রাতদিনের সে ডিউটি ভাগ বহুকাল হ'ল মশা-মাছিরা আর মানছে না। এখন দিনের বেলায় যেমন মশা ভনভন করে শহর কলকাতার যে কোনও অভিজাত পল্লীতে; তেমনই রাতে, তা সে যত রাতেই হোক না কেন মাছির দেখা মিলবেই, সে শুধু বাজারের পিছনের রাস্তার ডাস্টবিনেই নয়, সৌখিন গৃহস্থের সুচারু ড্রয়িং রুমেও।

এমন এক সময় ছিলো এই কলকাতা শহরে যখন সরকারি নথির লালফিতে ঠিকমত খোলা হ'ত, সব সময়ে নথি বন্ধ হয়ে থাকতো না। আর তা থাকলে যে সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার অবসর পায়নি সে সাম্রাজ্য অচল হয়ে যেতো। সুতরাং নথি মাঝেমধ্যে খুলতো, খুলতেই হবে এবং বলাবাহুল্য সেসব নথি নিতান্ত নীরস ছিল না। ফলে সেই নথিতে মাছি বসতো এবং নথি বন্ধ করার সময় দু-একটা মাছি নথির মধ্যে পড়ে দমবন্ধ হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করতো।

যাদের জন্যে মাছিগুলি এভাবে মারা পড়তো সেইসব সাহেব করণিকেরা, তাদের কিন্তু কখনই মাছিমারা কেরানি বলা হ'ত না, যদিও তারাই মাছিদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অন্যদিকে দিশি নকলনবিসেরা যারা শুধু ইংরেজি গড়ন দেখে এক নথি থেকে অন্য নথিতে বা অন্য কাগজে নকল করতো তাদের নাম হয়ে গেল মাছিমারা কেরানি।

না; মহাশয়, ন্যায়বিচারক ইংরেজ সাহেবরা দিশি করণিকদের কাঁধে মাছিহত্যার দায়িত্ব চাপানোর জন্যে এই নামকরণ করেননি। এই

নাম নকলনবিসরা স্বীয় কৃতিত্বে অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি অক্ষর পরিচয় না থাকায় কোনও পাতায় একটা মাছি পর্যন্ত মরে লেগে বা শুকিয়ে থাকলে তাঁরা নাকি সেই মরা মাছিটার ছবিটাও নকল করে দিতেন। ক্রমাগত এরকম করে করে অবশেষে তাঁরা একদিন ঐ অবিস্মরণীয় মাছিমাবা কেরানি উপাধি অর্জন করতে সমর্থ হ'ল।

হয়তো ব্যাপারটা যত সরলভাবে আমরা জানি এবং এখানে বলা হ'ল মাছিমারা কেবানি ব্যাপারটা অত সরল কিছু নয়।

সে যাহোক, আপাতত আমরা বিশেষ জটিলতার মধ্যে যাব না, পবিশ্রম পোষাবে না, মাছি ধরেছি, মাছিতেই থাকি। কেরানি, নথি ইত্যাদি দূরে থাক।

ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে মাছি ধরে সময় কাটানো। যদি হাতে থাকে অফুরন্ত সময়, আর না থাকে কোনও কাজ তাহলে মাছি ধরে সময় কাটানোর চেষ্টা করা যায়। তবে ঐ চেষ্টা পর্যন্তই, মাছি ধরা অত সোজা ব্যাপার নয়। প্রথম গল্পেই সেটা পরিষ্কার।

আপনি কখনও চেষ্টা করে দেখেছেন, মাছি ধরা? মাছির নাকি অনেক চোখ, চোখ আর চোখে ছাওয়া তার দেহ। পিছন দিক থেকে তাকে ধরতে গেলে সে দেখতে পাবে, সামনে থেকে, বাঁয়ে থেকে, ডাইনে থেকে যে দিক থেকে আসুন সে দেখবে।

মাছি ধরায় এক্সপার্ট ছিলেন খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রোমান সম্রাট ফেলবিয়াস অগাস্টাস। সম্রাটের অবসব বিনোদনের প্রধান উপায় ছিল মাছি ধরা। মাছি ধরার কত রকম কায়দা যে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। সময় নেই, অসময় নেই তাকে দেখা যেতো মাছির পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ধরতেনও বহু মাছি। তবে যেসব মাছি সম্রাট ফেলবিয়াস আগাস্টাস ধরতেন সেগুলো তিনি মেরে ফেলতেন নাকি অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করতেন সে বিষয়ে কোনও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

-চার্লি চ্যাপলিনের মাছি ধরা মনে আছে? একটা মাছি বহুক্ষণ ধরে চ্যাপলিন সাহেবকে বিরক্ত করছিলো। অবশেষে বহু ধৈর্য্য, বহু

পরিশ্রম খরচ করে তিনি একবার খপ করে মাছিটিকে ধরে ফেললেন, তারপর একটু পরেই সেটাকে ছেড়ে দিলেন। এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই অবাক কাণ্ড দেখে চার্লিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেকি এত কষ্ট এত পরিশ্রম করে মাছিটিকে ধরে তারপরে ছেড়ে দিলেন? চার্লি গম্ভীর হয়ে বললেন, আমাকে যে মাছিটি বিরক্ত করছিলো এটা সে মাছি নয়।'

শুধু চার্লি চ্যাপলিন, মহামতি চার্লি চ্যাপলিনের পক্ষেই সম্ভব দুটো মাছির তারতম্য ধরা, একটা মাছিকে আরেকটা মাছির থেকে আলাদা করে চেনা। আমাদের সামান্য জীবনে আমরা কত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মাছি দেখলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত চিনতে কি পেরেছি, নির্দিষ্ট করতে কি পেরেছি একটি মাছিকেও?

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

আগামী ১৭ই মাঘ রবিবার কল্যাণীয়া শ্রীমতী গিরিবালা মাতার বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। তুমি এই পত্র টেলিগ্রাম মনে করিয়া সত্বর রওয়ানা হইয়া আসিবে।'

অতঃপর দীর্ঘকাল চলে গেছে। টেলিগ্রামের মত পত্র আজকাল আর আসে না। অত্যন্ত নিকটাত্মীয়কেও লোকে আজকাল মুদ্রিত পত্র দিয়ে নিমন্ত্রণ করে এবং আঠারো মাত্রা পয়ারে লেখা থাকে 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনীয়।' এই অমার্জনীয় ত্রুটির পরেই বিশেষ দ্রষ্টব্য, লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।

একই ধরনের সব নিমন্ত্রণপত্র, একই ফর্মে ছাপা। সেই এক গৎ। সেই যথাবিহিত সম্মান পুরস্বর নিবেদন ইতি। তবু এরই মধ্যে নিমন্ত্রণ-কর্তার চরিত্রটি কখনো কখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা নিমন্ত্রণ পত্রে দেখেছিলাম পাত্রের পিতার নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা রয়েছে রিটায়ার্ড অন ১৮।৭।৭২। অবশ্য তার আগেই পাত্রের বাবা ভূতপূর্ব কি ছিলেন সেটাও দেড় লাইনে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনো রাজ্য পশু

চিকিৎসার অবর সহকারী অধিকর্তা, আবার কখনো বা বন্যজন্তু সংরক্ষণ সমিতির অস্থায়ী মন্ত্রণাদাতা। আরেকটি নিমন্ত্রণপত্রে কন্যাকুলের গ্রামের নাম উল্লেখ করে পাশে লেখা ছিল দীর্ঘকাল গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। এই দুটো যদি একত্র হতো, (হয়তো কোথাও হয়েছে, হয়তো কেন নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু আমার চোখে সেই পত্রটি পড়েনি) তাহলে কি হতো ?

দক্ষিণ রায়ণা, দীর্ঘকাল গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত অধুনা ১৭নং ঝাউবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা নিবাসী শ্রীব্রজহরি চক্রবর্ত্তী (এককালীন অবর সহকারী অধিকর্তা, রাজ্য পুলিশ চিকিৎসা এবং বন্যজন্তু সংরক্ষণ সমিতির অস্থায়ী মন্ত্রণাদাতা' রিটায়ার্ড অন ১৮।৭।২২) মহাশয়ের সপ্তম পুত্র···

কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক, বলা উচিত মর্মান্তিক, নিমন্ত্রণের চিঠি একবার পেয়েছিলাম, তার নীচে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে লেখা ছিলো,

এই পত্রে উল্লিখিত পাত্রীর নাম, পাত্রীর পিতার নাম ও ঠিকানা সকলই ভূয়া, উড়া চিঠি দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইবেন না।'

উড়ো চিঠি দিই আর না দিই, আমার সমস্যা হলো এই বিয়েতে উপস্থিত হবো কি করে, কোন্ ঠিকানায় ? স্বীকার করা ভালো যে, এই বিবাহবাসরে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং অবশেষে জেনেছিলাম সেই পত্রে ব্যবহৃত পাত্রের নাম ঠিকানাও কল্পিত ছিলো, ব্যাপারটা পুরোপুরিই ঠাট্টা।

তবু ঠাট্টা নয়, রসিকতা নয়, নাম-ঠিকানা কিছুই কল্পিত নয় এমন একটি বিবাহের চিঠি পেয়েছিলাম, বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক সেই চিঠি—

ওঁ গঙ্গা

সময়োচিত নিবেদনম এতৎ,

মহাশয়, আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ রবিবার সজ্ঞানে আমার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ দিন অপরাহ্নে ২৮নং দমদম রোডে আমার ইহলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে যথাসময়ে আগমনকরত আমাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবেন। ইতি—

ভাগ্যহীন

এ বালা তোমারই বধূ

দাম্পত্য কাহিনী সরাসরি লিখতে বা বলতে এ মর পৃথিবীতে কোনো পুরুষ মানুষই সাহস পান না। আর আমি এক চিরকালের কুখ্যাত কাপুরুষ, আমি নাম করণেই রবীন্দ্রনাথের মত বৃহৎ মহীরুহের পিছনে আশ্রয় নিলাম। জানি না শেষ রক্ষা হবে কিনা।

নিজেকে বাঁচিয়ে দূর থেকে একটি করুণকান্তি আহরণ করে এই মারাত্মক ও বিপজ্জনক আলোচনা শুরু করছি।

এক ভদ্রমহিলা আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা এনেছিলেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। যথাসময়ে আদালতে মামলা উঠলে সাশ্রুলোচনা বাদিনী বললেন, 'আমি টাকা পয়সা খেসারত, খোরপোষ বা ক্ষতিপূরণ কিছুই 'চাই না আমার এই দুষ্ট স্বামীর কাছে। শুধু এই মহামান্য আদালতে আমার বিনীত নিবেদন আমি এই বিয়ের আগে যে অবস্থায় ছিলাম, আমাকে সেই পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।'

বাদিনীর এই কাতর আবেদনের অর্থ ঐ আদালতের মাননীয় বিচারকের কাছে স্বাভাবিক কারণেই খুব প্রাঞ্জল বোধ হয়নি, তাই তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনি বিয়ের আগে কি অবস্থায় ছিলেন, কি অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছেন।' বাদিনী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে জানালেন, 'আমি এই বিয়ের আগে বিধবা ছিলাম হুজুর, আপনি আমাকে সেই বিধবা অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।'

প্রাক্তন বিধবা বর্তমান বাদিনী বিবাহ বিচ্ছেদের পর আর বিধবা অবস্থায় ফিরবেন না, তখন তার স্ট্যাটাস হবে। ডাইভোর্সড ; সুতরাং তাকে বিধবা অবস্থায় ফেরাতে গেলে বর্তমান স্বামীকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়, বলাবাহুল্য জজসাহেব তা পারেন নি। আইনে স্বামী-রত্নকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কোনো বিধান নাই।

সেক্সপীয়ার সাহেব অবশ্য তাঁর মার্চেণ্ট অফ ভেনিসে (২য় অঙ্ক নবম দৃশ্য) বিয়ে করা এবং ফাঁসি যাওয়া ভাগ্যের একই ব্র্যাকেটভুক্ত

করেছিলেন, Hanging and wiving go by destiny, আইন তা মানে না। আবার, সক্রেটিসকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, কোন মানুষ বেশী সুখি, যে বিয়ে করেছে নাকি যে অবিবাহিত। ঐ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিলেন, 'কোনো দিকেই বিশেষ সুবিধে নেই। তুমি যদি বিয়ে করো তা হলেও অবশ্যই একদিন আফশোষ করতে হবে। আর বিয়ে যদি না করো তা হলেও অনুতাপ হবে, বিয়ে করিনি বলে আফশোষ করতে হবে।,

আপনি কেন বিয়ে করেন নি? স্বামী নেই বলে আপনার কোন কষ্ট হয় না?' এই দুই প্রশ্নের উত্তরে একদা এক মধ্যবয়সিনী চিরকুমারী, ইংরাজীতে যাকে স্পিনসটার বলে, তিক্ত হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার একটা তোতা পাখি আছে সেটা সারাদিন চেঁচায়, আমার একটা শুয়োর আছে যেটা সবসময় ঘোঁত ঘোঁত করে আর একটা হুলো বেড়াল আছে যেটা সারারাত বাড়ির বাইরে থাকে। এর উপরে আমার আর আলাদা করে স্বামীর দরকার কি?

এই বিলিতি প্রৌঢ়া বিয়ে না করেও যে যথেষ্ট ভূয়োদর্শিনী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই কথিকাটির একটি বিপরীত সংস্করণ প্রচলিত আছে। সেটি নিশ্চয়ই অনেকে অবগত আছেন, নিজেও আমি একবার লিখেছি বলে সন্দেহ হচ্ছে' তবুও প্রাসঙ্গিক বলেই উল্লেখ করছি।

কাহিনীটি এক নবীন পানিপ্রার্থীকে নিয়ে। সে তার ভাবী বধূ সম্পর্কে বন্ধুদের বলেছিলো, 'যে আমার স্ত্রী হবে সে গান গাইতে পারবে, নাচতে পারবে, বক্তৃতা করতে পারবে, সে ঝলমলে হবে, স্মার্ট হবে, সব বিষয়ে কথা বলতে পারবে...' এই ফিরিস্তি আরো দীর্ঘ হওয়ার আগেই সেই উচ্চাভিলাষী যুবককে তার এক বন্ধু থামিয়ে দিয়েছিলো, সেই বন্ধু বলেছিলো, বুঝতে পেরেছি, তুমি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছো না। তুমি বিয়ে করতে চাইছো একটা টেলিভিশন সেটকে। তোমার চাহিদামত গুণাবলীর সবই তার আছে। যা কোনো একজন মেয়ের মধ্যে পাবে না।'

নব বধূর কাছাকাছি যখন এসে গেছি, তখন অন্ততঃ কিছুটা তার কথা বলি। মধু যামিনীতে সুন্দরী নববধূকে তার স্বামী গদগদ হয়ে একটি বোকা প্রশ্ন করেছিলো, 'হে রাজকন্যা, আমিই কি তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ ?' সুন্দরী রাজকন্যা ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিয়েছিলো, 'তুমি আমাকে এত সস্তা ভাবছো কেন বলো তো ?, তারপর একটু থেমে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'তা তোমাকে আর দোষ দিয়ে লাভ কি, সব পুরুষ মানুষই দেখলাম এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।'

নব বিবাহ সংক্রান্ত আরেকটি গল্প এর চেয়েও দুঃখজনক। ঠিক গল্প নয় একটি ঘটনা। বিয়ের দুদিনের মধ্যেই, শরীর থেকে হলুদ আর আতরের গন্ধ মুছে যাওয়ার আগেই খটমটি লাগলো। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিপুল কলহ, বাদবিসম্বাদ। সামান্য কারণে এ ওকে দোষারোপ করছে, ও একে শাপ শাপান্ত করছে। এদিকে ডাক বিভাগের গোলমালে বিয়ে প্রায় দশদিন পরে নবদম্পতির কাছে গ্রীটিংস টেলিগ্রাম এলো মধুর নবজীবনে উভয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রবাসী বন্ধু তারবার্তা পাঠিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, স্বামী-স্ত্রী কেউই সেই অভিনন্দন বার্তা গ্রহণ করল না। ইতিহাসে এই প্রথম, অভিনন্দন প্রেরকের কাছে বার্তাটি ফেরত গেলো রিফিউসড (Refused) বলে, যেভাবে উকিলের রেজিষ্টার্ড নোটিশ লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে হুবহু সেইভাবে। এই দুর্যোগময় আবহাওয়া থেকে এবার আমরা একটু পিছনে তাকাই। বিয়ের আগের ব্যাপার। এক প্রণয়সফল যুবক তার বন্ধুকে জানালো, 'ভাই, এক সঙ্গে যে দুটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছি।' বন্ধুটি উৎসাহ দিয়ে বললো, চমৎকার। চালিয়ে যাও।' প্রেমিক জানালো না, 'না ভাই, আর পোষায় না। এবার একটা বিয়ে তো করতে হয়।' বন্ধুটি তেমনিই তরলভাবে বললো, 'করে ফেলো,' এবার যুবকটি বললো, 'ভাই তোমার পরামর্শ চাই, দুজনের মধ্যে কাকে বিয়ে করবো সে ব্যাপারে।' এতক্ষণে বন্ধুটি পরামর্শ দাতার ভূমিকা পেয়ে সোজা হয়ে বসলো, জিজ্ঞাসা করলো, 'তা তোমার প্রেমিকা দুটি কে কেমন ? প্রেমিকটি বিশদভাবে দুটি মেয়ের রূপগুণ বর্ণনা করলো,

যার সংক্ষিপ্তসার হলো একটি মেয়ে সুন্দরী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী কিন্তু বড় গরীব। দ্বিতীয় মেয়েটি তেমন কিছু দেখতে নয়, লেখাপড়াও কম, খুব বুদ্ধিমতীও নয়; তবে বড়লোক। কোটিপতির একমাত্র মেয়ে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

পরামর্শদাতা সুহৃদ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে ভাবলো, তারপর বললো, 'ছাখো টাকা পয়সার কথা ছাড়ো। ওটা কিছু নয়। লেখাপড়া জানা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ে লাখে একটাও পাওয়া যায় না। গরীব হোক, তবু তুমি ওকেই বিয়ে করো। জীবনে টাকার ব্যাপারটা বড় ব্যাপার নয়।'

বন্ধুর সুপরামর্শ পেয়ে প্রেমিক প্রবর আশ্বস্ত হলে বন্ধুকে আলিঙ্গন করে সে বললো, 'ভাই, তুমি আমার মনের কথা বলেছো। আমিও আজ কয়েকদিন ধরে শুধু ঐ কথাই ভেবেছি। আমি ঐ গরীব মেয়েটিকেই বিয়ে করবো।'

এবার পরামর্শদাতার পালা। প্রেমিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করার পর এবং তার অভিমত জানার পর সে বললো 'ভাই, এটা ঠিক খাঁটি মানুষের মত কথা বলেছো এবং তুমি একটা সৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছো। ঐ গরীব মেয়েটিকে বিয়ে করার চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু হয় না। আর এতে তুমি সত্যিই সুখী হবে।' এরপর কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধতা, তারপর স্কন্ধদেশে অঙ্গুলি সঞ্চালন, তারপর একাধিকবার কণ্ঠ খাঁকরি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে শ্রীযুক্ত সুপরামর্শ বন্ধু বললো, 'ভাই, অন্য মেয়েটা কেন কষ্ট পাবে? ঐ যে বড় লোকের মেয়েটা, ও ঠিকানাটা দাওতো, আমি না হয় তাকে একটু দেখি।'

শ্রীযুক্ত সুপরামর্শ বন্ধু লক্ষহীরা দুহিতাকে একটু দেখুন, সেই ধনকুবেরতনয়া যে হয়তো খুব মোটা মাথায় এবং শরীরে, যে হয়তো সব দিকেই বেমানান, তার সঙ্গে সে এখন দু'চারদিন ঘুরুক, ধনকুবেরের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে মেয়েটির সঙ্গে সে প্রমোদ ভ্রমণে যাক, নৈশভোজে যাক পাঁচতারা হোটেলের রঙীন চন্দ্রাতপের নীচে। আর তার যদি আত্মসম্মানবোধ থাকে, সে ধনী কন্যাকে নিয়ে নিজের ক্ষমতায়

হেঁটে বেড়াক সন্ধ্যাবেলায় সস্তা ময়দানের সবুজ ঘাসে নিজের শেষ পয়সা দিয়ে কেনা পুরনো চিনেবাদামের খোশা ছাড়াতে।

আমরা তাকে বা তাদের ঈর্ষা করবো না।

ভাই নতুন যুগের নতুন পাঠিকা, ভাই গরীব যুগের সর্বহারা পাঠক তোমরাও তো পার সামান্য চিনেবাদামের পয়সা যোগাতে, সন্ধ্যাবেলার ময়দানের ঘাসে নরম হেঁটে বেড়াতে।

তোমরা ওদের ঈর্ষা করো না।

দীর্ঘজীবন

সাহিত্যের ক্লাশে সেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন অধ্যাপক। পড়াতে পড়াতে 'খুব ভাবাকুল হয়ে পড়েছেন' 'আজ যদি মহাকবি জীবিত থাকতেন তিনি আমাদের অবশ্যদ্রষ্টব্য হতেন।' অধ্যাপক বাক্য শেষ করা মাত্র একটি চ্যাংড়া ছেলে উঠে দাঁড়ালো, 'হ্যাঁ, স্যার, তাঁর চারশো বৎসর বয়েস হতো।' সেক্সপীয়র কিংবা যে কোনো লোকই যদি চারশো বৎসর কিংবা তার অর্ধেক অন্ততঃ দুশো বৎসরও বেঁচে থাকেন, তবে তাঁর আর কোনো কষ্টই প্রয়োজন নেই, তিনি এমনিই তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্যে সপ্তমাশ্চর্যের প্রথম বলে পরিগণিত হতেন।

কখনো ইরান থেকে, কখনো রাশিয়া থেকে কিংবা কখনো এই বাংলাদেশেরই কোনো অঞ্চল থেকে পৃথিবীর সেই সবচেয়ে দীর্ঘজীবি লোকটির নাম কাগজে বেরোয়। কখনো তাঁর বয়েস দেড়শো বছর, কখনো একশ বত্রিশ বছর কিম্বা ঐ রকম। তাঁর সম্বন্ধে নানা খবর বেরোয় কাগজে। তিনি দৈনিক সাড়ে চার মাইল রাস্তা হাঁটেন। তাঁর প্রপৌত্রীর বয়েস উননব্বই, তাঁর বংশধরদের সংখ্যা তিনশো সাতাশ তিনি বাহাদুর শাহকে দেখেছেন, তিনি সিপাহি যুদ্ধ দেখেছেন, তখন বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে এক ধরণের পাখি দেখা যেতো নাম ছিলো ক্যাঁচাও।

কি করে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? এর কি কোনো ফর্মুলা বা সূত্র আছে। ইংরেজী উপদেশ বলছে, ছটায় ঘুম থেকে উঠে দশটায় মধ্যাহ্ন-ভোজন; তারপরে ছটায় নৈশভোজন, দশটায় ঘুম, এই হলে শতায়ু হওয়া যায়। কিন্তু আমি জানি যে, অন্ততঃ সন্ধ্যা ছটায় নৈশভোজন সমাপ্ত হলে রাত দশটায় ঘুমই আসবে না। খিদের চোটেই ঘুম আসবে না। এই রুটিন মেনে চললে শতায়ু হয়তো দূরের কথা আমি ছয় মাসও বাঁচবো কিনা সন্দেহ।

একজন বললেন, নিরামিশভোজীরা দীর্ঘজীবী হয়, অমনি তিনজন অমর কসাইয়ের সন্ধান পাওয়া গেল—যাদের জীবিতাবস্থায় শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে এবং যারা সমস্ত জীবন দৈনিক প্রায় একটা করে পাঁঠা খেয়েছে। দুটি প্রবাদ আছে, কথা বেশী বললে আয়ু কমে যায়, আর হাসলে আয়ু বাড়ে। এরকম উল্টো ব্যাপার ভাবাই যায় না, কথা বলবো না কেবলইহাসবো, পাগল নাকি। সুকুমার রায় আবিষ্কার করেছিলেন, দেশে গেলে সবাই পটপট করে মারা যায়; শ্রীনিবাস দেশে গিয়েছিল সুতরাং সে আর ফিরবে না। আমাদের যাদের দেশ নেই, কিম্বা দেশে দেশে মোর ঘর আছে, তাদের অবশ্য এ সমস্যা নেই।

আসলে অধিকাংশ লোক যেরকম প্রায় বিনা কারণে সরে যায়, সেইরকম কিছু কিছু লোক বিনা কারণে বহুদিন বেঁচে থাকে। দৈনিক সোয়াসের করে তামাকের ধোঁয়া পান করে, জীবনে একদিনও তামাক না টেনে, সারাজীবন ধরে পরিশ্রম করে, সারাজীবন ধরে বিশ্রাম করে, সব কিছু করে, কিছুই না করে, ওষুধ খেয়ে, ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ না খেয়ে, ডাক্তার না দেখিয়ে কত বিচিত্র বিপরীত কারনে দীর্ঘজীবী হয় লোকে।

এ বিষয়ে একজন দীর্ঘজীবী লোকের বিবৃতি একবার পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন মশায়রা, আমি যে এতকাল বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণ বোধহয় ঐ ব্যাকটেরিয়া-ফ্যাকটেরিয়া ইত্যাদি আবিষ্কারের ঢের আগে আমি জন্মেছিলাম।"

আজকাল প্রায় সব রোগেরই কোনো না কোনো প্রতিকার বেরিয়েছে, শুধু ক্যান্সার আর করনারি ছাড়া। শিবরাম চক্রবর্তী

কোথায় যেন লিখেছিলেন, অধিকাংশ মানুষই মারা যায় হয় পরনারীর জন্যে, না হয় করনারির জন্যে।

করনারি-পরনারি-থাক, ক্যান্সারের বিষয়ে কিছু বলি।

সিগারেট খেলে কি ক্যান্সার হয়? এ বিষয়ে সমস্ত স্তরে, সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞ থেকে রাস্তার লোক পর্যন্ত সমান তর্কপ্রবণ হয়ে ওঠে। ইয়োরোপে ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞের এক অধিবেশন হয়েছিল কিছুকাল আগে। সেই অধিবেশনে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছিলেন, তুমুল হৈচৈ হয়েছিল সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয় কিনা, তাই নিয়ে। উত্তপ্ত অধিবেশনের শেষে সভাপতির ভাষণ, তিনিও ভুবনবিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি বললেন, 'সমবেত চিকিৎসকবৃন্দ, আমরা সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের এই তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনের পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতাবলী একত্র করে একটি মাত্র বাক্যে এই অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে সিগারেট খেলে গলায় ক্যান্সার হয়, সিগারেট না খেলে পেটে ক্যান্সার হয়।"

কোনো এক অফিসে

রাজেন বাবু আজ মাসখানেক অফিসে যাচ্ছেন না। তাঁর ধারণা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুদ্ধের খবর কি?

কোন্ যুদ্ধ কিসের খবর কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু ভেবে-চিন্তে আমি বললুম, 'চীনেরা তো চুপচাপ বসে রয়েছে, ওদের মতিগতি বোঝা কঠিন।,

'আর কদিন চুপচাপ থাকবে না থাকতে পারবে, জাপানীরা ওদের সব খেদিয়ে মঙ্গোলিয়ার ওপারে পাঠিয়ে দেবে।' রাজেনবাবু বিশেষ বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

'কিন্তু জাপান এর মধ্যে কি করবে।' আমার গলার স্বরে সংশয় বোধহয় স্পষ্ট হলো! রাজেনবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে বহু কথা বলে গেলেন। যার সারার্থ এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো চলছে। খবরের কাগজওয়ালা এই আঠারো-উনিশ বছর ধরে সংবাদ চেপে যাচ্ছে। তবে আর কতদিন চেপে রাখতে পারবে, মিত্র-শক্তির পতন অনিবার্য।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। আগেও যেন কোথাও শুনেছি না পড়েছি আরেক পাগলের কথা যার নাকি ধারনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এখনো চলছে। সে যাহোক রাজেনবাবুর ডালহৌসি স্কোয়ারে তাঁর অফিসে যাওয়ার মূল অসুবিধে ওটা নাকি মিত্রপক্ষের এলাকা। পাড়ার মধ্যে; আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁরা ডালহৌসি অঞ্চলের কর্মচারী তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই তাঁর ধারণা তাঁরা গুপ্তচর। গভীর অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, হুঁ-হাঁ করে দু'একটি কথা বলেন।

এই অবস্থায় রাজেনবাবুর স্ত্রী আমাকে একদিন বললেন, 'উনি তো আজ একমাসের ওপর অফিস যাচ্ছেন না। আপনি যদি ওঁর অফিসে গিয়ে একটু দেখেন এই দু'দিনে চাকরীটা না যায়। কি যে করি।

একদিন দুপুরে সময় করে রাজেনবাবুর অফিসে পৌছলাম। গিয়ে তাঁর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'এই ইয়ে। রাজেন-বাবুর ব্যাপারে একটা কথা জানতে এসেছি।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে পিয়ন ডাকলেন, ডেকে কি একটা ইঙ্গিত করে বললেন, 'রাজেনবাবু?' আমি কিছু জানাবার আগেই পিয়ন বেরিয়ে গেলো, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ড্রয়ার থেকে একটা পেন-নাইফ বের করে হাতের নখ কাটতে লাগলেন। আমি বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলাম। একটু পরে পিয়ন ফিরে এসে ইঙ্গিতে কি জানালো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টবাবু আমাকে জানালেন,

'রাজেনবাবু সিটে নেই।'

তখন আমাকে বলতে হলো. উনি সিটে নেই, আমিও জানি, আজ একমাস সিটে নেই। সেটাই বলতে এসেছি।'

'ও কোনা নালিশ আছে?' সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বেল বাজিয়ে পিয়নকে

বললেন, 'এই এঁকে বরদাবাবুর কাছে নিয়ে যা।'

পিয়ন আমাকে অফিসের মধ্যে একটা টেবিলের সামনে নিয়ে গেলো, তার সামনে বোর্ডে লেখা রয়েছে 'কমপ্লেইনটস'। বরদাবাবু নামে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো, খুব সদাশয়, হাসিহাসি মুখ। যা বললাম সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপরে একটা হাই তুললেন, একটা ডিবে থেকে নস্য বের করে নাকে দিয়ে আবার হাসিহাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। সন্দেহ হলো, মাথা খারাপ নয় তো। কিন্তু চোখের চাউনি দেখে তো মনে হচ্ছে না। আধঘণ্টা কথা বলার পরে বুঝলাম লোকটি বদ্ধ কালা।

আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ফিরলাম। ওঁকে বেল বাজানো, পিয়ন ডাকা ইত্যাদির কোনো সুযোগ না দিয়ে রাজেনবাবুর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললুম। সব শুনে তিনি যেন একটু আশ্বস্ত হলেন।

'তাহলে রাজেনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, আবার অনুরোধ করলাম, 'দেখবেন ওঁর চাকরিটার ক্ষতি না হয়। আমরা ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।'

'চাকরীর ক্ষতি? এই অফিসে?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রীতিমত অবাক হলেন, তারপর বললেন, 'এত সহজে এ অফিসে চাকরীর ক্ষতি হয় না মশায়। বরদাবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে?'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'ওই বরদবাবু আরে মশায় যেদিন ইলেকট্রিক ট্রেন শুরু হয় সেইদিনই ঝুলে আসতে গিয়ে একটা পিলারে গুঁতো খেয়ে সাতদিন অজ্ঞান। তিনমাস পরে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, কিন্তু কানে একদম শুনতে পান না। বসিয়ে দিলুম কমপ্লেইন ব্রাঞ্চে, যার যা নালিশ যত ইচ্ছা জানাও, কিছু শুনতে পায় না। গালাগাল করো, মৃদু মৃদু হাসবে। বড় অমায়িক স্বভাব ভদ্রলোকের তার উপরে কানে কালা।...অত সহজে কি চাকরী যায়? ভবানীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন। ডাহা তোতলা। ফোনের টেবিলে বসিয়ে দিয়েছি। একটি প্রশ্নের-ও জবাব পাবে না কেউ। অফিসে ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেছে।'

একটু থেমে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রশ্ন করলেন, 'বরদাবাবু মাঝে মধ্যে মারধোর করছেন তো ?'

হ্যাঁ কি না বলবো কিছু বুঝতে না পারে আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, আর একবার নখ কাটলেন তারপর বললেন. 'রিসেপশন টেবিলটা দেখলেন না আমার ঘরে ঢোকার আগে ? এখানে আগে ভরদ্বাজবাবু বসতেন ওঁকে পেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকতে হতো। ছ'মাস আগে এলে আমার সঙ্গে আপনার দেখা করাই হতো না। তখনো উনি রিটায়ার করেন নি। ভরদ্বাজবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে বড় অসুবিধায় আছি। রিসেপশন সেক্সনের লোক নেই অফিসে। বুঝলেন, আমাদের একটি আক্রমণপরায়ণ উন্মাদ দরকার, যান্ তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজেনবাবুকে নিয়ে আসুন।'

এই সময় বাইরে দুমদাম শব্দ শোনা গেলো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'সেরেছে, আজ আবার পেনসনের তারিখ। ঐ ভরদ্বাজবাবু বোধহয় পেনসন নিতে এলেন।'

আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুতগামী হলাম। পিছনে রিসেপসন টেবিলের উপরে কে যেন একটা চেয়ার আছাড় দিলো বলে মনে হলো।

ঘড়ি

খুব অল্প বয়েসে আমি মেলা থেকে একটা সচিত্র গোপাল ভাঁড় কিনেছিলাম। বইটা যে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ নয়, সেটা আমি অনেক বড় হয়ে বুঝেছি, কিন্তু সেই বয়সেও গোপাল ভাঁড় আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বোধ হয়েছিল। হয়ত এর রসিকতাগুলির অধিকাংশের কোনো মর্মোদ্ধার করতে পারিনি বলেই। এগুলির মধ্যে যেগুলি মোটা দাগের স্থূল বা অশ্লীল, তার মানে বড় হয়ে বুঝেছি, সবগুলি যে খুব হাসির তাও মনে হয় না এখন। কিন্তু এই বইয়ের মলাটে যে

প্রচ্ছদচিত্রটি ছিলো তার মানে আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি, হয়ত আমি যখন আরও বড় হব, অনেক বুদ্ধি হবে তখন হৃদয়ঙ্গম হবে ঐ প্রচ্ছদপরি-হাসিটির মর্ম।

মলাটের ঐ বিখ্যাত ছবিটি অনেকেই দেখেছেন, ছবিটি আর কিছুই নয়, গোপাল ভাঁড় রাস্তায় চলেছেন, তাঁর গলায় একটি ঘড়ি ঝোলান, তাঁকে একজন পথচারী প্রশ্ন করছে, 'কটা বাজে?' গোপাল ভাঁড় আকর্ণ বিস্তারিত রহস্যময় হাসির ছটায় আপ্লুত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছেন, 'কটা চাই?'

এই 'কটা বাজে আর 'কটা চাই' দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের দৃশ্যটি যতবার মনে পড়ে ততবারই হাসি পায় কিন্তু ঠিক হাসির কারণটা কি আজও ধরে উঠতে পরিনি। আসলে এর মধ্যে রসিকতা যতটা আছে তার থেকে অনেক বেশি বোধহয় রয়েছে একটি অতিবাস্তব চিরজিজ্ঞাসা। কারণে অকারণে, রাস্তায়-অফিসে, এমন কি জানলা দিয়ে বাড়ির মধ্যে মাথা গলিয়ে, ত্রিশ পয়সা ব্যয় করে টেলিফোন করে ক্রমাগত লোকেরা সময় জানতে চাইছে। ঘড়িহীন লোকদের ঘড়িওলা লোকদের কাছে এই সময় জানার অধিকার কবে কোন্ আইনে, কোন্ সংবিধানে ন্যস্ত হয়েছিল, ঈশ্বর জানেন, কিন্তু আপনার কাছে ঘড়ি থাকলে কেউ না কেউ আপনার কছে কখনও না কখনো সময় জানতে চাইবেই, আপনার আপত্তি করলে চলবে না, এমন কি গোপাল ভাঁড় যা করেছিলেন, 'কটা চাই?' প্রশ্ন করলেও প্রহৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে।

পরীক্ষার হলে, খেলার মাঠে, রেল স্টেশনে এই সব জায়গায় যেখানে সময়সীমা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত, সেখানেই বেশি প্রশ্ন ওঠে, 'কটা বাজে?' এই প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁদের অনেকের হাতেই অবশ্য ঘড়ি রয়েছে, হয় উত্তেজিত হয়ে তাঁরা নিজেদের ঘড়ি দেখতে ভুলে যান অথবা সময়ের চাপে পড়ে নিজেদের ঘড়ির উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

ঘড়ির কথা বলতে গেলে বলা উচিত ছিল আমাদের শৈশবের এ্যালার্ম ঘড়িটির সত্য কাহিনী। আমার এক মাসীমা আত্মরক্ষার জন্যে এই ঘড়িটি একটি আরশোলাকে ছুঁড়ে মারেন ফলে ঘড়ি,

আরশোলা এবং সেই সঙ্গে মাসীমা নিজে অজ্ঞান হয়ে যান। আরশোলাটি অজ্ঞান অবস্থাতেই মারা যায় আর ঘড়ি প্রায় ছয়মাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। পরের শীতকালে এ্যানুয়াল পরীক্ষার পর আমরা যখন মামার বাড়ি বেড়াতে যাই তখন অন্যান্য বছরের মত বহুবিধ দ্রব্যাদির সঙ্গে এই বন্ধ ঘড়িটি আমরা সংগ্রহ করে আনি এবং ফিরে এসে আমাদের ছোট শহরের একমাত্র ঘড়িসারাই-এর দোকানে টাইমপিসটি সারাতে দিই। মাস চারেক আমরা তিন ভাই ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে ঘড়িটি উদ্ধার করলুম। কিন্তু ঘড়িটি যদিও চালু হল, ঠিকমতো চালু হল না। প্রথম প্রথম অল্প অল্প ফাষ্ট হতো, তারপরে ঘণ্টায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট করে ফাষ্ট হতে লাগল। তাতেও আমাদের অসুবিধা ছিলো না, আমরা প্রতিদিন চাবি দেওয়ার সময় ঘড়ি মিলিয়ে দিতাম, এবং ঘড়ির পাশেই একটা চার্ট করে রেখেছিলাম যে চার্ট দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যেত, ঘড়িতে এখন দেড়টা বাজে অর্থাৎ প্রকৃত সময় পৌনে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। এই চার্টটি করতে আমাদের তিন ভাইয়ের দুই সপ্তাহ সময় লেগেছিল। আমাদের আঙ্কিক প্রতিভা দেখে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়েছিল।

কিন্তু ঘড়ি ফাস্ট যাওয়ায় ব্যাপার নয় সবচেয়ে গোলমাল হলো এ্যালাম যন্ত্রটি নিয়ে। ঘড়ির চাবি আর এ্যালামের চাবি কি করে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন সেই মফস্বলী কারিগর। দম দেওয়ার ঠিক বারো ঘণ্টা পরে ঘড়িটি বেজে উঠত। বাজনার তালে তালে টেবিলের উপরে নেচে নেচে লাফাত ঘড়িটা কখনও কখনও নিচে পড়েও যেত। দুবার কাঁচ ভেঙ্গে যায় একবার দাদার পায়ে পড়ে পা কেটে যায় কিন্তু ঘড়িটা কিছুতেই বন্ধ হত না। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হওয়ার পর আমরা টেবিলের নিচে একটা বালিশ পেতে রাখতাম ঘড়িটা নাচতে নাচতে সেই বালিশের উপর পড়ে যেত এবং তখনও বাজত, তারপরেও নাচত।

ভিখারি

আমরা যে বাসায় থাকি সেটা একেবারে সদর রাস্তার ওপর বসানো। একটা গুরুতর বাঁকে এমন কোণাকোণিভাবে বাড়িটা রয়েছে যে সতত সঞ্চরমান ভিখারিকুলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এই সামান্য স্থানটি এবং যেহেতু আমি একতলায় এবং বাড়ির সামনের অংশে থাকি এই বিপুল সাহায্যপ্রার্থী জনতাকে আমাকেই ক্রমাগত ঠেকাতে হয়।

আমার যাঁরা পরিচিত অনেকেই জানতে চান আমি কিভাবে ঠেকাই? ঠেকাতে পারি কি না? পারলেই বা কি রকম না পারলেই বা কি রকম? উত্তরে আমি জানাই এর আবার রকমসকম কি? প্রতিটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কায়দা ব্যবহার করি।

যেমন ধরা যাক আমাদের প্রতিবেশী সাবানের কারখানায় প্রাচীন কালের পেটা ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে ওঠার অব্যবহিত পরেই আর্বিভূত হন এক বন্যা প্রপীড়িত পরিবার স্বামী। স্ত্রী দুই পুত্র তিন কন্যা মাদুর লণ্ঠন এমনকি একটি লেজ কাটা কুকুর শুদ্ধ।

এই পরিবারটিকে স্বাগত জানাবার জন্যই জেগে থাকি। অনাথার এঁরাই আমার কাঁচা ঘুম চটীয়ে সমস্বরে এবং কাংস্য কণ্ঠে বাসি রুটির আবেদন জানাতে থাকবেন।

এঁদের সঙ্গে আমার একটা রফা হয়েছে। এরা আমার বাড়িতে এসে পৌছালেই আমি দরজা খুলে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা সময় মানে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সাম্প্রতিকতম হিন্দী সিনেমা নিয়ে আলোচনা করি পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা কুকুরটি ছাড়া এই পরিবারের প্রত্যেকে এই আলোচনায় পরম উৎসাহ ও উত্তেজনা সহকারে যোগদান করে। অলোচনা অন্তে ভিক্ষা নেওয়ার কথা মোটেই মনে থাকে না। এমনিতেই প্রসন্ন চিত্তে চলে যায়। মধ্য থেকে আমার সাপ্তাহিক এক টাকা সত্তর পয়সা ব্যয় বেড়েছে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একটি

সে যা হোক এখন অন্যান্য ভিক্ষুকদের কথা বলি। যাঁরা ভিখারি ভাবলেই মনে করেন শৃঙ্খলাহীন ভবঘুরে সমাজের কথা তাঁরা একবার এসে অন্তত সাতদিনের জন্যে থেকে যেতে পারতেন আমার বাসায়। প্রতিটি ভিখারিই একটি নির্দিষ্ট ছকে শৃঙ্খলা পরায়ণ জীবনযাপন করে। যে গড়িয়াহাট মোড়ের ডানদিকে দাঁড়ায় তাকে গুলি করে মেরে ফেললেও বাঁদিকের মোড়ে দাঁড় করানো যাবে না। তেমনি বাজারের ভিখারি বা ষ্টেশনের ভিখারি কোনো দিনে মোড়ে দাঁড়াবে না।

কিন্তু পাড়ার ভিক্ষুক একেবারে অন্য জাতের। যে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে পাড়ার মধ্যে ঘোরে সে আবার কিছুতেই বাজারে স্টেশনে বা মোড়ে যাবে না। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের মতো একটি নিয়মিত চক্রাবর্তনের মধ্যে সে দোলায়িত। একটা নিয়ম সে অনবরত মেনে চলেছে। হয় একই বাড়িতে সে সপ্তাহে একবারের বেশি আসবে না, না হলে দিনে একবারের বেশি আসবে না। আর খুব বেশি হলে প্রতি বেলায় একবারের বেশি আসবে না। অর্থাৎ সকাল দুপুর বিকেল এবং রাত এই চার বেলায় চারবার। যে সাপ্তাহিক আসে সে সপ্তাহান্তেই আসবে যে দৈনিক আসে সেও ঠিকই আসবে আর যে প্রতি বেলায় আসে সেও চারবার ভিক্ষা চাইতে আসবে প্রতিদিনই।

উষালগ্ন থেকে শুরু করে মধ্য রাত পর্যন্ত ভিখারির ধুম পড়ে যায় আমার দরজার সামনে। অনেক সময় একাধিক ভিখারির মধ্যে মারামারি বেধে যায়। সে মারামারি থামাতে হয় আমাকেই। যাকে কিছু দিই সে দু মিনিট চেঁচায় যাকে দিই না সে দশ মিনিট চেঁচায়।

এইভাবে চলছিলো গত সাত বছর।

সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে পরশুদিন থেকে। আমার ছেলেটির গরমের ছুটি হয়েছে। তাকে একটা বাঁধানো খাতা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি সদর দরজার পাশের জানলায়। যে ভিখারিই আসে তাঁকে সে প্রশ্ন করে তার নামধাম বয়েস ঠিকানা কতদিন ভিক্ষা করছে আর কতদিন করবে দৈনিক কত আয় হয় বংশে আর কেউ ভিক্ষুক

আছে কিনা ইত্যাদি বহুবিধ সরল বিষয়ে। উত্তরের বিনিময়ে প্রতি ভিক্ষুক পাবে একটি করে দশ পয়সা বলা উচিত এই দুদিনে একটি দশ পয়সাও ব্যয় করতে হয়নি খাতা-কলম প্রশ্নের বহর দেখে ভিখারিরা এখন পণ্ডিতিয়া থেকে পলাতক।

একটু ভেবে দেখুন

এক অসাধারণ ব্যক্তির একটি অসামান্য পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমি জেনে গেছি, সব মাছি একরমক নয়। রোগা মাছি যেমন আছে তেমনি মোটা মাছি, যদিও সাদা চোখে সেটা কখনোই বোঝা যায় না। সব দিক দিয়ে একরকম দেখতে দুটো মাছির ওজনে দেড়গুণ-দুগুণ তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং শুধু শারীরিক দিক দিয়েই নয় চরিত্রের দিক দিয়েও একেকটা মাছি একেক স্বভাবের। কিছু মাছি আছে অত্যন্ত অলস স্বভাবের, দেওয়ালে চুপচাপ বসে থাকে, খুব খিদে না পেলে কিছুতেই নড়তে চড়তে চায় না। আবার কিছু মাছি আছে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, সারাদিন কেবলই ভন্‌ভন্‌ করে বেড়ায়। কোনো কোনো মাছি অত্যন্ত রাগী ও হিংসুক প্রকৃতির; এদের নাকি যত্ন করে লক্ষ্য করলেই এদের স্বভাব বেশ বোঝা যায়—একদিকে কাৎ হয়ে বসে রাগের চোটে চোখের মণি ঘোরাচ্ছে। আবার নরম স্বভাবের মাছিও আছে, তাদের নীল চোখ দেখলে মায়া না করে পারা যায় না।

সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটির 'মাছি তত্ত্ব' পরিচ্ছেদে আমি এই তথ্যগুলি পেয়েছি। এ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদ এই বইটিতে আছে, বইটির নাম 'ভেবে দ্যাখো'। লেখকের নাম যে পাতায় লেখা ছিলো সেই প্রথম পৃষ্ঠাটি পাণ্ডুলিপি থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু একটু পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় এক অক্লান্ত, অনলস গবেষণাকারীর আজীবন পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থটি।

প্রতিটি পরিচ্ছেদই জ্ঞানগর্ভ এবং বিষয়-বস্তুর আপাত সামান্যতা সত্ত্বেও প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণীয়। আমাদের সামান্য পরিসরে 'ভেবে

ছ্যাখো' গ্রন্থের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা মাত্র দু-একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

যেমন 'দেশলাই কাঠি' অধ্যায়টির কথা ধরা যাক। দেশলাই কখনো জ্বালায়নি এমন লোক দেশে-বিদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা দেশলাই কাঠি কতক্ষণ জ্বলে? একটা ইলেকট্রিক বাল্ব কতক্ষণ জ্বলে আমাদের মোটামুটি ধারণা আছে, একজোড়া টর্চের ব্যাটারি কিংবা একটা সাধারণ মোমবাতির আয়ুকাল সম্পর্কেও আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান নেই তা নয়। কিন্তু একটা দেশলাই যা আমরা প্রতিনিয়ত জ্বালাই তার একটা পুরোপুরি জ্বালালে কতক্ষণ জ্বলবে; 'ভেবে ছ্যাখো' বইয়ের একশো সতেরো পৃষ্ঠায় এবিষয়ে যে তালিকা দেয়া আছে তাতে দেখা যায় আড়ই সেকেণ্ড থেকে সোয়া পাঁচ সেকেণ্ড। উত্তরটি আমি যত সহজে এখানে উপস্থাপন করলাম, বিষয়টি অত সহজ মোটেই নয়। যে কাঠ দিয়ে দেশলাই কাঠি প্রস্তুত হয় শ্রেণী ও গুণগত বিচারে তাকে যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই পাঁচটি ভাগে করা হয়েছে। একইভাবে দেশ-লাইয়ের বারুদকেও পরিমাণ ও গুণগত বিশ্লেষণ করে ক থেকে ঝ পর্যন্ত নয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন যদি ক শ্রেণীর কাঠিতে ক শ্রেণীর বারুদ লাগানো থাকে, সেই হলো সর্বোত্তম। সেই কাঠি বন্ধঘরে হাওয়ার আধিক্য বা অভাব না থাকলে সোয়া পাঁচ সেকেণ্ড ধরে জ্বলবে। অনুরূপভাবে একই পরিবেশে ঝ শ্রেণীর বারুদযুক্ত ঙ শ্রেণীর কাঠি মাত্র অড়াই সেকেণ্ড জ্বলবে।

এই বিষয়টি 'ভেবে ছ্যাখো'র গ্রন্থকার যত সহজ করে বুঝিয়েছেন আমার ক্ষমতায় সেটা সম্ভব হলো না, বড় জটিল করে ফেললাম। বরং একটা সহজ বিষয়ে আসি, 'লেজের আকার ও প্রকার।'

প্রথমেই মাছের লেজ। বানরের বা কুকুরের লেজ নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, এমন কি পাখির কিংবা টিকটিকির লেজ নিয়েও নয়। এদের শরীরে কোন, অংশটুকু লেজ সেটা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মাছের লেজ মাছের শরীরের কোন্ স্থান থেকে

সুরু। গ্রন্থের লেখক এ বিষয়ে বিভিন্ন মৎস্যবিজ্ঞানী জেলে, মাঝি, নিকারি এবং মাছওয়ালার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এসেছেন' যেসব মাছের ইলিশ, রুই ইত্যাদি) পেটি হয় তার পেটির পর থেকে লেজ আর সিঙি, মাগুর ইত্যাদি পেটি হীন মাছের শরীরের পিছন দিকের এক-পঞ্চমাংশ লেজ।

কিন্তু সাপের লেজ? সাপের তো পেটি গাদা কিছুই নেই, তার লেজের দৈর্ঘ্য কিভাবে মাপা যাবে। লেখক আসামের ও নাগাভূমির গহন জঙ্গলে গিয়ে জীবন সংশয় করে সর্পভুক জাতির লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারা তার বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারেনি, উল্টে তাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আগামী যুগের গবেষণাকারীদের কাঁধে এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে গেছেন, সাপের শরীরের কোন অংশটুকু লেজ তাদের অবশ্যই বের করতে হবে।

আশা করি আর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। একজন প্রকাশক পেলেই 'ভেবে ছাখো' বইটি বার করা যায়, তখন সকলে আরো অনেক তথ্য জানতে পারবেন। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।

পুনশ্চঃ 'ভেবে ছাখো' গ্রন্থটির লেখক যেদিন জানিয়েছেন যে তাঁর বইটির নাম সামান্য বদলিয়েছেন, এখন নাম হয়েছে, 'একটু ভেবে দেখুন।'

বনফুলের মালা

অনেকদিন আগে এক প্রবল বৃষ্টির দিনে একটি এগারো বছরের দুঃখিনী মেয়ে বনফুলের মালা গেঁথে রথের মেলায় বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন ঝড়জলে সে মেলা ভেঙ্গে যায়, রথের টান অর্ধেক না হতেই প্রবল বৃষ্টি নেমেছিল। রাধারানীর বনফুলের মালা কেনার কোন লোক পাওয়া গেল না। তারপর বৃষ্টিঘন নিশীথের পিচ্ছিল অন্ধকারে রাধারানী পথ হারিয়ে তার সেই বনফুলের মালা বুকে ধরে

কাঁদতে লাগলো। সে অনেকদিন, অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে। রথযাত্রার আনন্দ উৎসবের মধ্যে বহুদিন আগের সেই বনফুলের মালার ম্লান গন্ধ এখনো উন্মনা করে তোলে।

বঙ্কিমচন্দ্র মাহেশের রথের কথা লিখেছিলেন তাঁর 'রাধারানী' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে। মাহেশের রথ আমি দেখি নি দেখা হয়ে ওঠে নি। শ্রীধাম পুরীর জগৎ বিখ্যাত রথযাত্রা কিংবা কাছাকাছি গুপ্তিপাড়ার মেলাতেও আমার কোনদিন যাওয়া হয় নি। এর জন্যে আমার মনের গভীরে বিশেষ কোনো দুঃখ আছে তাও নয়? অত হই চই ভিড়ভাট্টা কেমন যেন পোষায় না এ বয়সে আর।

রথযাত্রা দর্শনের পুণ্যের প্রতি এই অনাসক্তি, এতে যদি আমার কোনো পাপ হয়ে থাকে প্রভু জগন্নাথ দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

তবু যে রথযাত্রায় যাওয়া হয় নি, এ জীবনে আর যাওয়া হবে না বলে আমার মনে চিরদিন দুঃখ রয়ে গেল, সে হলো ধামরাইয়ের রথ।

আমাদের ছোটবেলায় প্রত্যেক বছরই বর্ষার আগে আমাদের বাড়িতে তুমুল আলোচনা হত, এবার আমরা নিশ্চয়ই ধামরাইয়ের রথে যাচ্ছি, কিন্তু যথারীতি কোনোবারই শেষ পর্যন্ত যাওয়া হত না।

ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামের রথের মেলা সমস্ত পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত, যেমন মাহেশের রথ এপাশে। আমার ঠাকুমাকে নিয়ে আমার প্রপিতামহী সে রথে গিয়েছিলেন বিয়ের পর নতুন বৌকে জগন্নাথ প্রণাম করাতে, সে বোধহয় একশো বছর আগে। তারপর আমার মাকে নিয়ে আমার ঠাকুমাও গিয়েছিলেন একই যাত্রায়, সেও পঞ্চাশ বছর।

ধামরাইয়ের রথের মেলা আমি স্বচক্ষে দেখি নি কিন্তু তার স্মৃতিকথা শুনেছি। পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল থেকে আদি রথের বেশ কিছু দিন আগে হতেই হাজার হাজার নৌকোয় গৃহস্থ পরিবারের নারী, বৃদ্ধ-শিশুসহ রওনা হতো মেলার উদ্দেশে। কারও তিনদিনের পথ, কারও সাত দিনের পথ, কারও বা তারও বেশী। ধলেশ্বরী, যমুনা, পদ্মা কত

বড় বড় নদী, আর আশ্চর্য সব নামের ছোট নদী আর দিগন্তপ্রসারী বিল পাড়ি দিয়ে তারা এসে পৌঁছাত। সেখানে উল্টোরথ পর্যন্ত এবং হয়তো বা তারও পরে কিছুদিন কাটিয়ে সবাই ফিরে আসতো স্বগ্রামে।

দূর দূরান্ত থেকে পসারীরা আসত গ্রামাঞ্চলের বিচিত্র সব পণ্য নিয়ে যেত ঢাকা আর কলকাতা থেকে শখের মনোহারী দোকান। নৌকোয় নৌকোয় রান্না হত টাটকা ধরা ইলিশ কিংবা অন্য কোনো মাছ, আর খিচুড়ি। সঙ্গে থাকত প্রচুর কাঁঠাল। আর ফজলি আমের জাহাজী নৌকো আসত তেরো নদী পার হয়ে মালদা থেকে।

আমার জীবনে প্রাপ্যের কোনো অভাব নেই তবু এরই মধ্যেই নিতান্ত যে সব স্বপ্ন সফল হয় নি, যে সব দুঃখ আর কোনদিনই পূরণ হবে না তার মধ্যে এই একটি হলো ধামরাইয়ের মেলায় না যাওয়া। আমি বড় না হতে হতে দেশ বিভাগ হয়ে গেলো' তার আগে এক বছর গেল বন্যা, পরপর দু-বছর মন্বন্তর। আর দেশবিভাগের পরে ধামরাইয়ের জলপথ তেমন নিরাপদ ছিল না। মেলার গৌরবও ধীরে ধীরে কমে এসেছিলো। পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু গৃহস্থ পরিবারের কাঠামো ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধামরাইয়ের রথের উৎসব ম্লান হয়ে এসেছিল।

এতদিন পরে আজ আর জানি না সে মেলা এখনো বৎসরান্তে বসে কি না।

যে রথের মেলার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল সে হল সন্তোষের রথের মেলা। সন্তোষ টাঙ্গাইলের পাশেই সন্তোষের মহারাজার প্রাসাদ ও মন্দিরমুখী একটি মাঠে একটি বড় কাঠের রথকে কেন্দ্র করে বৎসরান্তে সাপ্তাহিক উৎসব জমে উঠত।

টাঙ্গাইলের শহরের মধ্যে একটা লম্বা খাল শহরকে দু-ভাগ করে রেখেছে। সেই খাল থেকে আমরা নৌকো ভাড়া নিতাম। বাঁশের ছই দেয়া ঢাকাই নৌকো। খুব বড় নয়, জলের উপরে সেটা দুলতো ক্রমাগত, অল্প বয়সে বেশ ভয়ই হতো।

আবার যে সব বছর ব্যবসায় অনেক লোকজন হতো, আত্মীয় কুটুম এসে যেত এবং সেই সঙ্গে খালে যথেষ্ট জল থাকত পানসি নৌকো ভাড়া করা হত। বৃষ্টি না হলে সে নৌকোর ছাদেও অনেকে বসে যেতে পারত। প্রয়োজন মত পাড়া প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হত রথযাত্রায় আমাদের সঙ্গে নৌকো ভ্রমণের জন্যে।

টাঙ্গাইলের খাল ধরে শহর বরাবর গিয়ে নৌকো পড়ত কাগমারিতে লৌহজঙ্গ নামে এক ছোট নদীতে। এই সেই বিখ্যাত কাগমারি, 'শালিধানের খই আর কাগমারির দই' ছড়ার ভিতরে যে অমর হয়ে আছে। আরও পরে আধুনিক কালে ভাষানির মৌলানার জন্য বিখ্যাত কাগমারি। লৌহজঙ্গ পাড়ি দিয়েই কাগমারির মধ্য দিয়ে সন্তোষের খালে, সেখানে তখন নৌকায় নৌকারণ্য।

টাঙ্গাইল থেকে সন্তোষ, মাত্র দু-তিন মাইল জলপথ কিন্তু আমার শৈশব-কৈশোরের সেই নৌকাভ্রমণ আজ পর্যন্ত তার তুল্য আনন্দময় আর কিছু আমার জীবনে ঘটে নি।

নৌকোর ছই কিংবা পানসির ছাদের উপর বসে মৃদু চলমান প্রতিদিনের চেনা টাঙ্গাইলের সদর রাস্তা পেরিয়ে মানদায়িনী সিনেমা হলের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে বর্ষার ভরা লৌহজঙ্গের জলে। লৌহজঙ্গ ছোটো কিন্তু সে নদী নয় নদ, লৌহজঙ্গ নদ। এবছর টাঙ্গাইল গিয়ে দেখলাম সে নদী মজে, গতি হারিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, সে আর নদী নেই। কিন্তু এক কিশোরের সুদূর স্মৃতিতে সে আজও চঞ্চল উচ্ছল।

বন্যার বছরে লৌহজঙ্গকে বিরাট, বিশাল মনে হত। তখনো আমি সমুদ্র দেখি নি, ভাবতাম সমুদ্র হয়ত এই রকম।

'লৌহজঙ্গের মাঝবরাবর, তখন আমি খুব ছোট, খুব ভয় পেয়ে নৌকোর মাঝি যে বৈঠা ধরে বসেছিল, তাকে বলেছিলাম, 'আমার কেমন ভয় হচ্ছে। ডাঙ্গা এখান থেকে কতদূর। প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।' আমার কাকা আমার ঠিক পিছনে বসেছিলেন, তিনি বললেন, 'এখান থেকে ডাঙ্গা মাত্র দশ বারো হাত।' কথাটার মানে পরে বুঝেছিলাম, পার যতদূরেই থাক না কেন, জলের নিচের মাটি দশ বারো

হাতের চেয়ে বেশি তাহলে ছিলো না।

লৌহজঙ্গ পার হয়ে বেনুবনচ্ছায়াঘন কাগমারির মধ্য দিয়ে নৌকো চলেছে, ছোট খাল, এ বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে ও বাড়ির তুলসী-মণ্ডপ ছুঁয়ে সন্তোষে প্রবেশ। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মেলার হই হট্টগোল, খোলকরতালের শব্দ, তালপাতার বাঁশির আওয়াজ।

সন্তোষের রথের মেলায় কিন্তু পাঁপড় পাওয়া যেত না। তেলেভাজাও পাওয়া যেত না। তেলেভাজা নামক বস্তুটির স্বাদ পাই কলকাতায় এসে। পেঁয়াজি ফুলুরি ইত্যাদি টাঙ্গাইলে কল্পনা করাও যেত না। এখনও পাওয়া যায় না।

তবে জিলিপি ছিল। আমরা বলতাম জিলাবি। আর ছিল বিন্নি ধানের সুগন্ধি বেলফুলের মত খই এবং চিনির সাজ, রথ হাতি ঘোড়া নানা আকারের শুকনো শক্ত মিষ্টি।

তবে খই বা মিষ্টি নয় রথের মেলার সঙ্গে মধুরে মধুর হয়ে জড়িত হয়ে আছে যে স্বর্গীয় খাদ্যদ্রব্যাদির স্মৃতি সেটি একটি অপার্থিব ফল নাম নটকা। নটকার মত অমন অম্লমধুর ফল কদাচিৎ কোথাও পাওয়া যাবে। বহুদিন সে ফল কোথাও দেখি নি, ডুমুরের মত গোলাকার, শক্ত খোসা, মধ্যে তিনটে কি চারটে কোয়া, কালো বিচি, পাকলে গোলাপি আভা দেয় সবুজ ফলে।

দেশের রথের মেলার সঙ্গে নটকা গায়ে-পিঠে জড়িয়ে আছে, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রামাছড়ায় সে ফল ঢুকে গেছে,

আগ রথে যামুনা ভাই
পাছ রথে যামু
আমায় তোমায় পয়সা দিয়া
নটকা কিনা খামু।

কোনো কোনো বছর অঝোর বৃষ্টিতে ভেসে যেত রথের মেলা। জলঝড়ের মধ্যে শুধু কয়েকজন অটল ভক্ত মেলার প্রাঙ্গনে মোটা দড়ি দিয়ে গভীর কাদাজলে কঠোর পরিশ্রমে জগন্নাথের অচল রথ টেনে নিয়ে যেত। সেবার আর আমাদের ঠাকুর দর্শন করা হত না, মেলার

মাঠে আমাদের নামা হত না. আমরা ছইয়ের উপরে ছাতা মাথায় দিয়ে উঠে দূর থেকে জগন্নাথের রথের চূড়া দর্শন করে কপালে হাত ঠেকাতাম। আশপাশের নৌকোয় নৌকোয় চলত কেনা বেচা। নটকা, বিন্নি, সাজ সবই কেনা হত জলের উপরে নৌকোয় বসে কিন্তু মেলার মাঠে নামা হত না।

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে। বহুদিন আগের এক বনফুলের মালায় ম্লানগন্ধ বৃষ্টিভেজা বাতাসে ভেসে আসে। একাকার হয়ে যায় মাহেশ ও সন্তোষ, বৃষ্টি ও রথযাত্রা স্মৃতি ও উপন্যাস। বঙ্কিম-চন্দ্রের রাধারানী অখ্যাত এক গ্রাম্য নদীর তীরের এক ভাঙ্গা মেলায় বৃষ্টি জলে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে বনফুলের মালা হাতে একা একা অঝোরে কাঁদে। এখনো কাঁদে।

আনন্দময়ীর বিসর্জনে

আনন্দময়ী কোনদিন জানতে পারলেন না, ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না আমরা কত দুঃখে আছি, সারা বছর কত দুঃখে থাকি।

সারা বছর আমাদের যায় আধপেটা খেয়ে, ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় দালালি, উঞ্ছবৃত্তি ও তঞ্চকতায়।

আনন্দময়ী এসব কখনো জানতে পারেন না। তিনি এসে দেখেন আমরা ভালমন্দ খাচ্ছি। আমাদের উৎসবমুখর দিন, আমাদের আনন্দোজ্জ্বল পোশাক। বছরের চারটে দিন আমরা হাসিমুখে, সেজেগুজে থাকি।

আমাদেরই হিসেবে গোলমাল। আমাদেরই ভুল। জগজ্জননী এসে আমাদের দেখে, আমাদের আলো হাসি, উচ্ছলতা দেখে, গান বাজনা শুনে ভাবেন এরা তো বেশ ভাল আছে। তাই আমাদের দুর্গতি মোচন হয় না। আমাদের দুর্দশা দূর হয় না। সারা বছর জুড়ে যে আমাদের নিষ্প্রদীপ, অর্ধাহার, অসুখ ও গ্লানি আনন্দময়ী তা কখনো

জানতে পারেন না। তিনি দেখেন আমরা আনন্দে আছি, সুখে আছি, আলো-উজ্জ্বলতা দেখে হাসিমুখে কৈলাসে ফিরে যান।

বছরের এই মহার্ঘ চারদিন আমরা যদি যেমন সারা বছর খাই পরি যেরকম খারাপ খেতাম, খারাপ থাকতাম, খারাপ পরতাম মা জননী হয়তো আমাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতেন কিন্তু তিনি তো জানতেই পারেন না।

পুজো শেষ। আনন্দময়ীর বিসর্জন হয়ে গেছে। মা জননী স্বর্গে ফিরে গেছেন। সেই সঙ্গে ফিরে আসছে আমাদের পচা চাল, লোডশেডিং, আটপৌরে পোশাক। আমবা ফিরে যাচ্ছি আমাদের নিতান্ত আটপৌরে দৈনন্দিনতায়।

একেকটা পুজো যায়। জীবনেব আয়ু থেকে একেকটা বছব সাদা মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে অনন্তে মিশে যায়। আমাদের মাথার চুলে পাক ধরে, দাঁতের গোড়া নড়ে ওঠে, আমাদের কপালে আরো একটা নতুন রেখা যোগ হয়। চোখেব চশমার কাঁচ বদল হয়। বিছানার পাশে টুলে হাতল ভাঙা কাপ উঠে আসে, তার মধ্যে ভেজানো থাকে নকল দাঁত। কারো পবচুলা ঝোলে মশারির পাশে পেরেকে।

সুতরাং বয়েস বাড়ছে। চশমা, সাদা চুল, স্থূলোদব ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক নিয়মে এটা হবেই। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু প্রতিবার পুজোর সময় এই বয়েস বাড়ার ব্যাপারটা এত বেশি করে ভাবায়, বছরের আর কোনো সময় এমন হয় না। বিসর্জনের ঢোলের বাজনায় ঢ্যাম কুড় কুড়, ঢ্যাম কুড় কুড় বেজে ওঠে। 'আরেকটা বছর এমনি গেলো, আরেকটা বছর এমনি গেলো।' মহালয়ার শেষ রাতে শুরু হয়ে যায় স্মৃতি বেদনা, তারপর বিসর্জনের গঙ্গায় দেবী প্রতিমার সঙ্গে ভাসান হয়ে যায় জীবনের আরেকটা দায়সারা বছর। অসফল তিনশো পঁয়ষট্টি দিন।

এ সব ইনিবিনি দুঃখের পুরনো কথা থাক। বরং দু,একটা রঙীন গল্প বলি।

মহানবমীর দিন অবশেষে বাধ্য হয়ে বাড়ির সকলের সঙ্গে ঠাকুর

দেখতে বেরিয়েছিলাম। উত্তর কলকাতায় এক লোক গিজগিজ মণ্ডপের বাইরে একটি বছর আটেকের ছেলেকে দেখি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা আলোর খেলার দিকে। টুনি বাল্‌ব দিয়ে একটা ফুটবল খেলার গোল হওয়ার দৃশ্য—সেটা সে অতি উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। এমন সময়ে লাউড স্পিকারে শোনা গেল, 'অনল, অনল কুমার চক্রবর্তী বয়েস সাড়ে আট বছর, বুড়ো শিবতলা থেকে এসেছো…' ছেলেটি মাইকে এটুকু ঘোষণা শুনেই, আমি ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির লোকজনের প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো, তারপর আপন মনেই বলে উঠলো 'এই যা, আবার আমি হারিয়ে গেলাম'।

পরের ঘটনাটি অপেক্ষাকৃত জটিল। সেটি ঘটলো দক্ষিণ কলকাতায়। যথারীতি মণ্ডপের বাইরে ততো মারাত্মক ভিড় না, এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় এক ভদ্রমহিলা সামনের দিকে এগিয়ে এলেন।

ভদ্রমহিলাকে দেখে চেনা চেনা মনে হ'ল। অনেকদিন আগে পরিচয় ছিলো। দক্ষিণ কলকাতার এক শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। দশ বারো বছর আগে কিছুদিন আমার ছেলে এর কাছে পড়েছিলো।

শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া আমাকে দেখে ভদ্রতার খাতিরে এগিয়ে এলেন। নিশ্চয়ই আমাকে দেখেও চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু এ কয় বছরে আমি অনেক স্থূল, ভারিক্কি এবং বুড়োটে হয়ে গেছি। ঠিক আমার সামনে হাসিমুখে এগিয়ে এসে তারপরে ভদ্রমহিলা কেমন থমকিয়ে গেলেন, তাঁর হয়তো খটকা লাগলো আমি সেই একই ব্যক্তি কিনা কিন্তু ততক্ষণে তাঁর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তাঁকে মুখ খুলতেই হলো। কিন্তু তিনি যা বললেন তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিনি মার্জনা চেয়ে জানালেন, দেখুন কিছু মনে করবেন না। বোধহয় আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় আমার আগের এক বাচ্চার বাবা।

পুজো এলো এবং চলে গেলো। যেমন চিরকাল আসে আর যায়।

ঝড়ের মত আসে, ঝড়ের বেগে চলে যায়। নবমীর নিশি বড় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। অনেকদিন আগে এক আধুনিক কবি লিখেছিলেন—

বোধনের ঢুলি বাজাবেই শেষে
বিসর্জনের বাজনা
থাক থাক সেতো আজ নয়
সেতো আজ নয় আজ না

কিন্তু থাক থাক করে কিছুই কি ধরে রাখা যায়? কিছুই কি ধরে রাখা যাবে?

তা যাবে না। ঢাকের শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যায়। শূন্য মণ্ডপে সঙ্গীহীন ক্ষীণ প্রদীপ শিখা স্মরণ করিয়ে দেয় গত দিনের উৎসব রজনীর কথা। বাতাসে আরেকটু হিমেল ভাব, শরতের শেষ শেফালি ঝরে পড়েছে অনাদরে ধুলোভরা রাস্তায়। পুরনো গৃহস্থবাড়ির ছাদের শিখরে জ্বলছে কোনো সনাতন পৃথিবীর অমল আকাশ প্রদীপ।

খবরের কাগজ আর আবহাওয়াওয়ালাদের ঝড় বৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণ করে চমৎকার সৌরকরোজ্জ্বল শারদীয়া ছিলো এবার। ছিলো নিবিড় নীল চন্দ্রতারকা খচিত, হিমের পরশ মেশানো রাত্রি। আর সবচেয়ে আরাম ছিলো সকালবেলাগুলোয়, প্রভাতী খবরের কাগজ ছিল না। কি শূন্যতা, কি শান্তি।

পুজোয় আমি চেষ্টা করে ভালো থাকি। ভালো থাকার প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরী হলো দ্রব্যমূল্যাসুরের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা।

এর আমি একটা ছোট সমাধান বার করেছি। অতি প্রয়োজনীয় নয় এমন কোনো জিনিস পুজোর সময় কিনি না। আর কাপড় চোপড় কিনি সরকারি বা খাদির দোকান থেকে। মহাষ্টমীর দিন হাজীর দোকানে লাইন দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি মাংস কিনতে যাই না। বিজয়া দশমীর দিন ষাট টাকা দিয়ে ইলিশ মাছ কেনার জন্য মারামারি করি না।

ফলে উত্তেজনা কিছু কম থাকে। যথাসাধ্য ঘরে বসে পুজোর কাগজ, পুরনো না পড়া বই পড়ে একটু আরাম আয়েসে থাকার চেষ্টা

করি। পারতপক্ষে বেরোই না। তবু দিন বড় বেশি তাড়াতাড়ি যায়। পূজোর পরে যথারীতি যেমন ছিলাম দ্রুত তেমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। কোনো প্রভেদ হয় না। শুধু দিন আরেকটু ছোট, রাত আরেকটু ঠাণ্ডা। কলকাতার জীবনের তার একটু নিচুতে বাঁধা।

একদা এক বিদেশী কবরখানায় এক সমাধি ফলকে লেখা দেখেছিলাম, 'আমি জানতাম এরকম হবে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি সেটা ভাবিনি।'

প্রত্যেকবার পূজোর পরে ঐ সমাধিফলকের কথা আমার মনে পড়ে। জানতাম আরেকটা পূজো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে সেটা ভাবিনি।

শুভ বিজয়া।

প্রত্যাবর্তন

রেলের টাইমটেবিলে রেলপথের যেমন একটা ম্যাপ থাকে, খুব সম্ভব যাযাবর পাখিদেরও মনে মনে সেই রকম একটা ম্যাপ আছে। একই পথে বছরের পর বছর তাদের যাতায়াত। এই রকম একটা আকাশ পথের নীচে কলকাতা থেকে কিছু দূরের একটা ছোট বাড়িতে আমি কয়েক বছর বাস করেছিলাম।

সেখানে শীতের দিনে যথারীতি খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার হতো। ইলেকট্রিক আলোহীন, অচঞ্চল অকর্মণ্য রাত্রিতে সকাল সকাল শুয়ে পড়াই একমাত্র কাজ ছিলো। ফলে ঘুম ভাঙতো খুব ভোরে।

শীতের প্রথম দিকে এই রকম কোনো কোনো ভোরবেলায় হঠাৎ দ্রুত হাততালির শব্দ শোনো যেতো। মনে হতো দূরে কোনো বিরাট সভায় খুব করতালি পড়ছে। আসলে তখন বহু দূরের কোনো বরফের দেশ থেকে যাযাবর পাখিদের ঝাঁক আসছে কলকাতার আশেপাশে খালে বিলে।

এরই কয়েক মাস পরে গরমের শুরুতে ফিরবার পালা।

পাখিদের এই বাৎসরিক যাতায়াতের সাক্ষী হওয়া আমার প্রায় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই রকম দেখতে গিয়ে কখনো কখনো চোখে পড়েছে দু একটা পাখি ছিটকে পড়ে গেলো নীচে, দুটি অক্ষম ক্লান্ত ডানা আর উড়তে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। বিরাট দলের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, যেমন উড়ে যাচ্ছিলো তেমনই যাচ্ছে।

এক দিন আমারই চোখের সামনে বাড়ির উল্টোদিকের বড় নালায় একটা যূথভ্রষ্ট পাখি ঝুপ করে পড়ে গেলো। জলকাদায় ডানার ঝাপটানি শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললাম পাখিটাকে। সাদা-কালোয় মেশানো বকের মত নরম, তুলতুলে একটা পাখি। তারপর সেই পাখিটাকে আলতো করে তুলে এনে আমার ঘরের মধ্যে একটা বাঁশের ঝুড়ির নীচে ইট চাপা দিয়ে রাখলাম।

স্নান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারাদিন কাটিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরেছি তখন সকালের সেই পাখিটার কথা আমার মনেও ছিলো না। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকে দরজা খুলতেই ঝুড়ির নীচে ঝটপট শব্দ শুনে পাখিটার কথা মনে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁড়িটা তুলে দিলাম।

ভোরবেলার সেই নির্জীব পাখিটা এতক্ষণে গায়ে যেন একটু বল পেয়েছে, হঠাৎ একটা ঝাপটা দিয়ে পাশেই আলমারির উপর উঠে বসলো। শীতের দিন। জানলা বন্ধ ছিলো, ঘরে ঢুকেই দরজাও ভেজিয়ে দিয়েছিলাম, না হলে হয়তো বাইরের অন্ধকারেই চলে যেতো।

আমি ঠিক করলাম কাল সকালেই পাখিটাকে উড়িয়ে দেবো, না হলে এখন বেরিয়ে গেলে শেয়ালে বা বিড়ালে খেয়ে নেবে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাখিটাকে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু পাখিটা গেলো না একটু উঠেই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভয় পেয়ে আমার বাড়ির ছাতের উপর ঘুরে এসে বসলো।

পাখিটা আর গেলো না। সারাদিন বাড়ির সামনের নালাটার পাশে কি সব খুঁটখাট করতো কিছু হয়তো পোকামাকড় ধরে টরে

খেতো। সন্ধ্যার পরে আমি যেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকতাম সেও ঢুকে পড়তো, ঢুকেই সেই আলমারির মাথায়।

এইভাবে প্রায় তিন চার মাস গেলো শেষের দিকে আমি বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েই পড়েছিলাম, এক রাত্রির জন্যেও কলকাতায় এসে থাকা সম্ভব ছিলো না। একটা বাজে দায়িত্ব বলে মনে হতো পাখিটাকে। এদিকে পাখিটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। দিনের বেলায় আমি এবং আমার ঘর সম্পর্কে সে ছিলো সম্পূর্ণই উদাসীন। স্বজন-বান্ধবহীন, অপরিচিত বিদেশে আমি শুধু তার রাত্রির আশ্রয়দাতা।

সারারাত চুপ করে আলমারির মাথার উপরে বসে থাকতো পাখিটা কিন্তু একদিন ভোরের দিকে ভীষণ পাখার ঝটপটানি শুরু করলো। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে আমি একটা জানালা খুলে দিলাম। তখন শীত শেষ হয়ে এসেছে এবং জানলা খুলতেই বহু দূর থেকে ভেসে আসা পাখির ঝাঁকের শব্দ ক্ষীণ শুনতে পেলাম।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে উঠোনে চলে এলাম, পাখিটাও উড়ে বেরিয়ে এসে ছাদে বসলো। যতই পাখির ঝাঁকের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগালো ততই ছাদের এতদিনের দলছুট পাখিটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। তারপর পাখিদের সেই বিরাট প্রসেশন যখন ঠিক মাথার উপর এসে গেলো, আমার পাখিটা আর একটুও দ্বিধা না করে একবারও নীচের দিকে না তাকিয়ে উড়ে গিয়ে ঝাঁকের মধ্যে মিলে গেলো। দু মিনিটের মধ্যে আকাশ ফাঁকা, শুধু বহু দূরে তখন ক্ষীণ পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

রশিপুরম কে লক্ষ্মণ

এক বিশালদেহী পালোয়ান পেশী ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশেই এক জোড়া মুগুর আর ডাম্বেল। তাঁর সামনে এক প্রৌঢ়

ভদ্রলোক আরেকজনকে বলছেন, 'উনি অবশেষে রাজি হয়েছেন। যাক এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এতদিনে একজন শক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর পাওয়া গেল।'

অথবা,

এক সাবান কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভা চলছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন, তাঁর হাতে একটা আস্ত সুপুরির আকারের ছোট একটা জিনিস। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছেন, 'আমাদের প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা অনুযায়ী আমরা সাবানের দাম বাড়াতে পারছি না, আর সেইজন্যে সাবানের সাইজ ছোট করে আনতে হয়েছে।

এ দুটি, এবং এরকম হাজার হাজার তুচ্ছতি-তুচ্ছ এবং সম্ভব-অসম্ভব সাময়িক বিষয়ের উপরে বছরের পর বছর কার্টুন এঁকে গেছেন, লক্ষ্মণ; রশিপুরম কে লক্ষ্মন।

ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সহিত্যিকদের মধ্যে একটি অতি বিখ্যাত নাম আর কে নারায়ণ। তাঁর ভাই লক্ষ্মণ, আর কে লক্ষ্মণ। আর মানে রশিপুরম কিন্তু কে মানে কি সেটা ঠিক চট করে হাতের কাছে পেলাম না। যাকগে অত কিছু দরকার নেই, রশিপুরম কিংবা আর কে বাহুল্য ; লক্ষ্মণ নামই যথেষ্ট। এই নামেই ভারতীয় সংবাদ-কার্টুনে তিনি বিখ্যাত। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন সকালবেলা প্রভাতী সংবাদপত্রে এই ব্যঙ্গচিত্রীর কৌতুকচিত্র দেখে হাসিমুখে দিন আরম্ভ করেন।

সংবাদপত্রের শুধু সাধারণ পাঠক নয়, ভারতবর্ষের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী অসংখ্য মানুষ তাঁর রসবোধের অনুরাগী। রাজনীতিবিদরা তাঁকে সমীহ করেন, না হাসলে বোকা দেখায় তাই সরকারি কর্মকর্তারা তাঁর ব্যঙ্গচিত্রে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখেও যথাসাধ্য হাসেন।

লক্ষ্মণের কার্টুনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? তাঁর দেখবার ভঙ্গি, তাঁর কৌতুকী ক্যাপশন নাকি তির্যক চিন্তা। আসলে সেগুলি ত সব ব্যঙ্গচিত্রেরই খড়-মাটি-রঙ, তবে লক্ষ্মণ কেন আলাদা ?

লক্ষ্মণের ছবিতে একটা সারল্য আছে, একটা ব্যঞ্জনা আছে যা

মসাময়িক এবং স্পষ্ট। বন্যাত্রাণ থেকে হরতাল, মন্ত্রিসভার পতন থেকে পরিবার পরিকল্পনা কি নেই লক্ষ্মণের সীমানায়।

গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে অন্তত পনের হাজার কার্টুন এঁকেছেন লক্ষ্মণ, প্রতিদিন সকালের জন্যে একটি করে, তাছাড়াও এদিকে-ওদিকে টুকো-ছাটকা।

লক্ষ্মণের কার্টুনে, প্রায় সব কার্টুনে রয়েছে এক সাদামাটা মানুষ। তার পরণে ধুতি আর চেক-চেক গলাবন্ধ কোট লোকটির মাথায় বড় টাক, পাকা চুল, চোখে চশমা, নিতান্ত সাধারণ এক ব্যাক্তি। কোন কার্টুনেই তাঁর যেন কোন ভূমিকা নেই, কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়েও কিছু হবে না। তিনি এই বিশাল দেশের একজন সামান্য নাগরিক। সংবাদপত্রের গরিষ্ঠসংখ্যক পাঠক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্য-শিক্ষিত সমাজের তিনি নীরব প্রতিনিধি। সেই চেক-চেক কোট পরা লোকটি সব জায়গায় রয়েছেন, সবকিছু স্বচক্ষে দেখছেন, কিন্তু সে নিজে কিছুর মধ্যে নেই। যে সভায় বিদ্রোহী নেতা মাইক ভেঙ্গে বক্তৃতা করেছেন সেই সভামঞ্চের পেছনেই সেই চেক-কোট পরা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। যে ঘরে বড় সাহেব টেবিলের নিচে বাঁ হাত বাড়িয়ে ঘুষ ভেবে মাইনে নিচ্ছেন সেই ঘরের মধ্যেই সেই চরিত্র আর যেখানে চিত্রপ্রদর্শনীতে আর দশটা ছবির সঙ্গে শিল্পী একটা ক্যানভাস দেখাচ্ছেন যাতে লেখা আছে, 'স্ত্রী এবং চারটি সন্তানের ভরণপোষণ আমার করতে হয়, সেই প্রদর্শনীতে ঠিক সমালোচকের পিছনেই নিঃশব্দে উপস্থিত এই ব্যক্তি। যাকে আমরা বলতে পারি শ্রীযুক্ত সাধারণ।

লক্ষ্মণের কার্টুন বর্ণনা করে কোন লাভ নেই। আমার ক্ষমতা নেই আমার ভাষায় সেই কার্টুনমালার মজা বোঝান। এই ত আমার চোখের সামনে রয়েছে উনিশ-শ আটষট্টি সালের একটা কার্টুন, যা ভারতীয় সমসাময়িক রাজনীতির একটি অমূল্য দর্পণ।

কার্টুনটি বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। একটি সুসজ্জিত মঞ্চ। দরের টুপি মাথায়, চাপা পাজামা, শেরোয়ানি পরা এক ব্যক্তিকে মালা পরাতে যাচ্ছেন এক অফিসার শ্রেণীর ভদ্রলোক। সামনে

দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফটোগ্রাফার, অন্য লোকজন এবং আমাদের শ্রীযুক্ত সাধারণ। মঞ্চের ডানদিকে ছুটে আসছেন উর্দ্ধশ্বাস, উদ্যত হস্ত এক ব্যক্তি, সাংবাদিক অথবা অফিসার, তাঁর হাতে একটা কাগজ, তিনি বলছেন, থামুন! থামুন! মালা দেবেন না! এই মাত্র আমি খবর পেলাম উনি আর মুখ্যমন্ত্রী নেই। এই মাত্র বিপক্ষ দলের লোকেরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।'

লক্ষ্মণের কার্টুনগুলি বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। তার থেকে কিছু কিছু ছবি বেছে অনেকগুলি বই বেরিয়েছে, যেগুলির ধারাবাহিক নাম, 'তুমি বলেছিলে, তুমি এই বলেছিলে।'

একদা লক্ষ্মণ বলেছিল, আমার বর্ণনাগুলি বড়ই ক্ষণজীবী। যখনকার যা বড় খবর তার সঙ্গেই সেগুলি যুক্ত, সেই সাময়িক ঘটনার গুরুত্ব একদিন কমে যায়, তখন হারিয়ে যায় আমার ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা। সংবাদ বাসি হয়ে গেলে, কোন বিষয়ে উত্তেজনা কমে গেলে তখন আর সেই বিষয়ের উপর ব্যঙ্গচিত্র দেখে মজা-পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মণের এই বিনয়ের মধ্যে সত্যতা নেই তা নয়। যে কোন সাংবাদিক; সংবাদচিত্রী, প্রতিবেদক মনে প্রাণে জানেন তাঁর এই সীমাবদ্ধতা সময়ের সীমায় বন্দী তাঁর তুলি বা কলম।

তবু কিছু কিছু থেকে যায়। যা ভোলা যায় না। যা ক্ষণকালের উত্তেজনাকে বহুদিনের জন্যে স্মরণীয় করে তোলে।

লক্ষ্মণের অসংখ্য তাৎক্ষণিক ছবির মধ্যে সত্যি-সত্যি রয়েছে সময়ের গণ্ডী পেরন অনেক বঙ্কিম দর্শন। শিক্ষামন্ত্রী দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির নক্সা, স্থপতি বোঝাচ্ছেন, এ বাড়িতে কোন গোলমালের সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ কোন গেট নেই, কোন ছাত্র এর ভিতর ঢুকতে পারবে না। কিংবা সেই পাশাপাশি দুটি একই রকমের সাঁকো একই খালের উপরে। একটি ইংরেজীতে, অপরটি হিন্দিতে দুটি অর্ডার এসেছে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে দুই ভাষায়, তিনিও দুটি নির্দেশই মান্য করেছেন।

আরেকটা, এক রাজনৈতিক নেতা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যে তিনি

তাঁর ছেলেকে লাইসেন্স পাইয়ে দেবার ব্যাপারে তদ্বির করেছেন বা অন্যদের প্রভাবিত করেছেন, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে, 'আমি নিজেই আমার ছেলেকে পারমিট দিয়েছি, অন্যকে ধরাধরি করব কেন?'

কলকাতা থেকে

পুজোর মধ্যে একদিন সকালবেলা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মেডিক্যাল কলেজের পিছন দিকের গেটের সামনে ফুটপাতে হাসপাতালের ভেতর থেকে একটি ছোটো পরিবার এসে দাঁড়ালো, বাস অথবা রিকশার জন্যে, তারা একটু ব্যস্ত মনে হলো। তারা মানে, দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে, তার হাত ধরে ছোট ভাই, তার বয়েস বছর চারেক হবে আর সঙ্গে মা, মায়ের কোলে কাঁথায় জড়ানো একটি শিশু।

ভিতরেই প্রসূতিসদন। নিশ্চয় সেখান থেকেই এরা এলো। বোন এবং ভাই মা-কে নিতে এসেছিলো। কোনো কারণে অসুখ হয়ে বা অন্য কোনো অসুবিধের জন্যে এদের বাবা, যে এই পরিবারের কর্তা, সে আসতে পারেনি। ছোটো দিদির ওপর দায়িত্ব পড়েছে মাকে হাসপাতাল থেকে, নিয়ে আসার। মায়ের বয়েসও কিছু না, সদ্য-প্রসবের ক্লান্তি জড়ানো গরীব ঘরের বৌয়ের মুখ দেখে দূর থেকে যতটুকু অনুমান করা যায়, কিছুতেই তিরিশের বেশি নয়। একেবারেই গরীবের ঘর, এই পুজোর দিনে শুধু একজনের চার বছরের ভাইটির গায়ে একটা নতুন জামা সস্তা রঙীন হাফসার্ট। কারোরি পায়েই জুতো নেই।

অনেকটা পথ হেঁটে এসে আমি উল্টোদিকে ফুটপাতের উপরে একটা বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছিলাম। সকাল থেকেই ট্রামে বাসে ভিড় শুরু হয়ে গেছে। আমি আর সামান্য পথ যাবো, হেঁটেই যাবো। কিন্তু এরা, এই কচি শিশুকে নিয়ে এই দুর্বল জননী? এই উৎসবের শহরে

কোন্ খালি গাড়ি এদের জন্যে আসবে? একটা রিকশাওয়ালার সঙ্গে কিছু দামদর হলো দেখলাম, কিন্তু দরে বনলো না। খালি রিকশা ঠুন্ ঠুন্ করে চলে গেলো। রঙীন জামা গায়ে ছোট ছেলে চলে যাওয়া রিকশাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর কোলের শিশুটিকে বড় মেয়ের কোলে খুব সাবধানে তুলে দিয়ে, ছোটো ছেলেটির হাত ধরে মা রাস্তার দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলো। একটু পরে রাস্তা পার হয়ে ঠিক আমি যেখানে বসেছিলাম, তার সামনে দিয়ে চলে গেলো। শক্ত করে চার বছরের ছেলেটিকে ধরে রেখেছে একটি রুগ্ন হাত, তাতে টলটল করছে একটি লাল পলার চুড়ি, যার গায়ে মরচে ধরা সেফটিপিন লাগানো, কাছে আসতে মুখ ভালো করে দেখা গেলো না? কতকটা রোদ্দুরের জন্যেই বোধ-হয় আধময়লা পুরানো শাড়ির ঘোমটায় মুখটা ঢাকা।

আস্তে আস্তে হেঁটে তারা দূরে চোখের আড়ালে চলে গেলো। আমি সেই বেঞ্চিতে বসে আরেক গেলাস স্যাকারিনে আধতেতো চা খেলাম। এই এত বড় শহরে এরকম দৃশ্যের অভাব নেই, তবু পুজোর দিনে সকালবেলায় কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেলো।

অনেকদিন আগে দেখা, প্রায় সম্পর্কহীন একটা ছবির কথা আমার মনে পড়লো। পনেরো-বিশ বছর আগে হবে, আর প্রায় পনেরো-বিশ বছর আগেকার একটা বাঁধানো মাসিকপত্রে, বোধ হয় প্রবাসীই হবে, কার আঁকা মনে নেই, একটা রঙীন ছবি। ছবিটার নাম খুব সম্ভব ছিলো গণেশ-জননী। শিশু গণেশকে কোলে নিয়ে পার্বতী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে, তার টানা-টানা দুই চোখে মাতৃস্নেহের অমল অঞ্জন। মায়ের কোলে গণেশ একদৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ অকারণেই আমার অনেক কথা মনে পড়লো। কেন যেন আমার নিজের মার কথাও মনে হলো। এতক্ষণ আমাদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে পুরানো দালানের বারান্দায় বাচ্চা নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পুব দিকের রোদ ভাঙা সিঁড়ির উপর এসে পড়েছে। মা

হয়তো রান্নাঘরে। মধ্যে মধ্যে আমার পাগল দাদা ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে মাকে বিরক্ত করছে, 'খোকন যে পুজোর সময় আসবে বলেছিলো?' কিছু দূরে টাঙ্গাইল কালীবাড়িতে বারোয়ারি পুজোর ঢাক বাজছে, সকালবেলার শান্ত বাতাসে আমাদের বাড়ি থেকে সেই ঢাকের বাজনা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আমি চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের কাঠের বেঞ্চিতে বসে খুব আলগোছে কান পেতে ধরলাম, ঢাকের বাজনাটা শোনা যায় কিনা?

একদিন রাত্রে

অনেক রাত্রে এসে পৌঁছেছি, তখন দেখিনি, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই দেখলাম বারান্দায় তিনটে বেড়ালছানা খেলা করছে। একটু পরে মা-বেড়ালকেও দেখতে পেলাম। দেখেই চিনতে পারলাম, বছর দুয়েক আগে শেষবার যখন দেশের বাড়িতে এসেছিলাম, বাজারের পাশে থেকে একে কুড়িয়ে আনি। সেই বেড়ালটার এই তিনটে বাচ্চা হয়েছে।

দুটো বাচ্চা সাদায়-কালোয় কমবেশি মেশানো, চমৎকার। সে দুটোর মধ্যে একটার নাম দিলাম গঙ্গা-যমুনা তার গায়ে সাদার ভাগ বেশি। অন্যটার কালোই বেশি মধ্যে দু একটা সাদা সাদা ডোরা তার নাম দিলাম পদ্মা-মেঘনা। বাকিটা একেবারেই কালো কুচকুচে, তার নামকরণ হলো সোজাসুজি কৃষ্ণা। তিনটে বাচ্চারই সদ্য চোখ ফুটেছে। আমাদের পুরানো বাড়ির টানা বারান্দায় তারা লুটোপুটি হয়ে খেলা করছে।

চারদিকে ঘোর বর্ষা। মার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতা থেকে আমরা সবাই ছুটে এসেছি। আমরা অধিকাংশ সময়েই বাসার মধ্যে জলবন্দি। মায়ের আশেপাশে আর আমাদের পায়ের কাছে বেড়াল-ছানাগুলো খেলা করে। মাকে নিয়ে আর তাদের নিয়ে আমাদের সময় কাটে। আমাদের কাছে বাচ্চাদের নিশ্চিন্তে রেখে বেড়ালের মা এবাড়ি-

ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায়, হঠাৎ কখনো এসে দুধ দিয়ে যায়। আমাদের ওখানে শেয়ালের বড় উৎপাত। তাই রাতের বেলায় আমরা একটা ব্যবস্থা করলাম, একটা পুরানো চালের খালি ড্রামে বাচ্চাগুলিকে ভরে দিলাম। বেরোতে পারবে না, হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে উঠোনে বা বারান্দায় চলে গিয়ে শেয়ালের পেটে যাবে না।

এর মধ্যে একদিন এক প্রতিবেশী এসে কালো বাচ্চাটাকে দেখে বাবাকে বললেন, 'কালো বিড়াল বড় অমঙ্গুলে, একে বিদায় করুন।' গুরুতর অসুস্থ হলেও মার জ্ঞান ছিলো, মা বললেন, না থাকবে।' দুদিন পরে এক বিকেলে মা মারা গেলেন। মনে আছে, সেদিন শুক্লাদশমী ছিলো। রাত দুটোর কিছু পরে, তখন চাঁদ ডুবে গেছে, অন্ধকার টিপটিপ বৃষ্টি, আমরা চার ভাই আর শ্মশানবন্ধুরা ফিরে এলাম। বারান্দায় আমার স্ত্রী, পাড়াপ্রতিবেশী অনেক লোক লণ্ঠন জ্বেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, একটু দূরে আবছা অন্ধকারে এক পাশে বাবা ইজিচেয়ারে পাথরের মত বসে রয়েছেন। আমরা পুকুরে স্নান করে এসেছিলাম, হাত-পা ধুয়ে, গায়ে-মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে অনেককাল পরে চার ভাই পাশাপাশি মেজেতে শুয়ে পড়লাম। দরজা খোলা বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে সেই রকম বসে রয়েছেন, উঠোন থেকে মার হাতে লাগানো কলাপতি ফুলের ভেজা গন্ধ আসছে, বাবাকে একবার ডাকলাম, বাবা অনেকক্ষণ পরে একটু সাড়া দিয়ে চুপ করে রইলেন। এক সন্ধ্যায় সমস্ত বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। শোকে-ক্লান্তিতে আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিলো, এমন সময় ছোট ভাইয়ের ডাকে চমকে উঠে বসলাম। শোয়ার সময় পায়ের কাছে লণ্ঠনটা জ্বলছিলো, সেটা নেই, দরজা তেমনিই খোলা কিন্তু ইজিচেয়ার শূন্য বাবা সেখানে নেই।

দু ভাই ছুটে বারান্দায় গেলাম। আর দু ভাই উঠে বসলো। গিয়ে দেখি বারান্দার নিচে উঠোনে ঘাসজঙ্গলে বৃষ্টির মধ্যে এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে বাবা উবু হয়ে কি খুজছেন। এগিয়ে গেলাম, কাছে যেতে চোখে পড়লো একটা বেড়াল ছানা, কৃষ্ণা বাবার হাতে আর বাকি

ভুটোকে নিচু হয়ে বাবা ধরার চেষ্টা করছেন, বার বার পালিয়ে যাচ্ছে ধরতে পারছেন না। আমরা দু ভাই সে ভুটোকে ধরে ফেললাম।

শোকের বাড়িতে কেউ খেয়াল করে বেড়ালছানাগুলোকে ড্রামে বন্দী করে রাখিনি। খোলা দরজা দিয়ে কখন তারা বেরিয়ে পড়েছে, হয়তো আরেকটু হলে শেয়ালে নিয়ে যেতো। বেড়ালছানাগুলোকে নিয়ে ভিতরের ঘরে ড্রামের মধ্যে দিয়ে দিলাম। বাবার সঙ্গে কোনো কথা হলো না, বাবা আবার নিঃশব্দে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন।

সত্যি প্রেমের গল্প

সত্যি কি আমি কখনো প্রেমে পড়েছিলাম ?

সেই যে বছর পনেরো আগে একবার ভীষণ বৃষ্টি নেমেছিলো এক সপ্তাহ ধরে। আমি তখন যেখানে থাকতাম আমাদের সেই উদ্বাস্তু উপনিবেশের এক প্রান্তে দায়সারা সরকারী বাড়িতে, তার চারদিক জলে জলাময় হয়ে গিয়েছিলো। সারাদিন ধরে আমার কিছুই করার ছিলো না, কোনো বন্ধু না, তেমন কোনো বই না।

আমি চুপচাপ পশ্চিমদিকের একটা জানলার পাশে বসে থাকতাম, প্রথমত এই কারণে যে জলের ঝাপটা এই দিকে কম লাগতো, আর এই জানলার উপরে একটা সেড ছিলো বিকেলবেলার রোদ্দুর আটকানোর জন্যে যেটায় বৃষ্টির ছিটেও অনেকটা বাধা পেতো ; আসলে সেই খোলা মাঠের মধ্যে নতুন গড়ে ওটা অঞ্চলে রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া সব কিছুরই প্রতাপ খুব বেশী ছিলো।

কিন্তু সেই প্রচণ্ড বর্ষায় শুধু বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে জানলায় বসে থাকার জন্যেই আমি পশ্চিম দিকের জানলাটা বেছে নিয়েছিলাম একথা ঠিক নয়। আর একটা কারণ ছিলো। এবং সেই কারণটাই বড়ো। ঐ জানালা দিয়ে ঐ নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ফাঁকে কয়েকটা নতুন ওঠা কলাগাছের সবুজ কচিপাতার আড়ালে একটি মেয়েকে দেখা যেতো। কখনো ঘরের

কাজ করছে, কখনো বই পড়ছে, কখনো বা জানলায় এসে দাঁড়িয়ে আমার মতই বৃষ্টি, মেঘ বা জলস্রোত দেখছে অথবা কিছুই দেখছে না এমনিই তাকিয়ে আছে।

এই মেয়েটি আমারই পাশের বাড়ির। বহুদিন ধরে পাশাপাশি আছি, আমারই চোখের সামনে বড় হলো, এই সেদিনও বালিকা ছিলো। এর সম্বন্ধে আমার কোনোই কৌতূহল নেই, কখনো তেমন ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি।

কিন্তু এই অবিরাম বৃষ্টিপাতের মধ্যে বন্দী, নিঃসঙ্গ এক মুহূর্তে বৃষ্টির ছিটের আড়াল থেকে, যেমন হয় আর কি, হঠাৎ মেয়েটিকে কেমন অন্যরকম মনে হলো। জানালার পাশে চেয়ার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ওকে দেখতাম, ও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানি না, খুব সম্ভব করেনি।

আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অস্পষ্টতার আড়াল ছিলো। মেঘলা দিনের অঘোর-অন্ধকার, বৃষ্টির ধারা ও ছেঁড়া কলাপাতার ইতস্তত পর্দা —এই সূক্ষ্ম দূরত্ব সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের সাতদিন ধরে আমাকে নিবিষ্ট করে রেখেছিলো। আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন, প্রায় প্রতি মুহূর্ত।

এ-কথা ঠিক যে সেই সময়ে আমার আর কিছুই করার ছিলো না, শুধু অলস বসে বসে বিরক্ত হওয়া ছাড়া। কিন্তু এতদিন পরে এখনো যখন কোনো কোনো দিন চারদিন ঘিরে খুব বৃষ্টি আসে, হঠাৎ সেই সাতদিনের কথা মনে পড়ে, তার প্রতি মুহূর্তে শ্যামলতার স্পর্শ লেগে আছে, কোথাও এক বিন্দু বিরক্তির তিক্ততা নেই।

একদিন বৃষ্টি অবশেষে যথারীতি থেমেছিলো। উঠোন থেকে, রাস্তা থেকে জল নেমে গেলো। তারপরে রোদ উঠে রাস্তাঘাট শুকালো। আমি আবার নৈমিত্তিক জীবনে ফিরে গেলাম। সেই একই বাড়ি ঘর, উঠোন-দুয়ার ; কলাগাছগুলো আরেকটু ঘন হয়েছে, সবুজ আড়াল বেড়ে গেছে। কিন্তু তবু পাশাপাশি বাড়ি বলেই মেয়েটিকে আসা যাওয়া, কাজকর্মের ফাঁকে প্রতিনিয়ত দেখতে পাই।

কিন্তু সেই জলে ঘেরা দিনগুলিতে যে আবেশ ও মোহ রচিত, যা শুধু আমার জন্যেই, নিতান্তই আমার একার সেই অনুভব, সেই স্তব্ধ মুগ্ধতা বোধ আর ফিরে এলো না। যাই-আসি, দেখা হয়, এই পর্যন্ত।

এখন অনেকদিন হয়ে গেছে, সেই ভাঙা বাড়ি ও তার খণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সবুজ কলাপাতার মৃদু কম্পনে আলোড়িত, বৃষ্টির জলে ঘেরা সেই সাত দিনের কথা মনে পড়লে কি রকম যেন অনুভূতি হয়, হয়তো একবার, অন্তত ঐ একবার আমি প্রেমে পড়েছিলাম।

বাসাবদল

আমার বাবা যে বাড়িতে জন্মে-ছিলেন, এখনো সেই বাড়িতেই বসবাস করছেন। সেই একই ভিটে, সেই একই চৌহদ্দি শুধু পুরনো আমলের বড় টিনের আটচালা আর নেই, তার জায়গায় দালান উঠেছে। সে দালানেরও বয়েস পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেলো; তার দরজা-জানালার কপাট কবে নড়বড়ে হয়ে গেছে, মেজে চটে গেছে, কোথাও কোথাও পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে অনেকদিন।

তবু আজন্ম বাবা সেই বাড়িতেই আছেন। সেই বাড়িতেই তাঁর অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শুভবিবাহ হয়েছে। মধ্যে দু-চার বছর শুধু একবার ছাত্র-জীবনে, আরেকবার এই সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় এসে একনাগাড়ে কিছুদিন ছিলেন।

এ রকম সকলের জীবনে হয় না। আমার নিজের জীবনেই হলো না। বলা উচিত, বিপরীত হয়েছে। প্রায় দুই যুগ আগে কলেজে ভর্তি হতে মফস্বল শহর ছেড়ে নাবালক বয়েসে কলকাতা এসেছিলাম, তারপর এই এতদিনে কত রকম আস্তানা বদল হলো তার হিসেব করা কঠিন। এখন যেখানে আছি, সেখানেও আর কতদিন থাকবো আমি নিজেই জানি না।

বাসা বদলানোর নানা ঝামেলা। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ বাসা বদলাতে চায় না। নতুন বাসা থেকে নতুন বাসায় ক্রমাগত ভাড়া বেড়ে চলে। কিন্তু অবিবাহিত জীবনে যেখানে রাজার মত কেটে যায় সেখানেই হয়তো সংসার পাততে গিয়ে দেখা যায় অনেক অসুবিধে যা একদিন নজরেই আসে নি। তারোপরে একদিন ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে স্কুলে যায়, তাদের স্কুলের কাছাকাছি কি একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না ?

হয়তো পাওয়া যায়, বেশি ভাড়া দিলে, উপযুক্ত সেলামি সংগ্রহ করতে পারলে অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু স্কুল বা অফিসে যাতায়াত নয়, নাগরিক জীবনে বাসা বদলের সঙ্গে আরো অনেক সমস্যা জড়িত।

রেশন কার্ড পালটাতে হবে, পালটাতে হবে দুধের কার্ড। দরকার পড়লে ইলেকট্রিকের মিটার, গ্যাস থাকলে গ্যাসের সরবরাহকারী সব পরিবর্তন করতে হবে। ধোপা, নাপিত, খবরের কাগজওয়ালা, গোয়ালা সব নতুন করে ঠিক করতে হবে। মিটিয়ে দিতে হবে আগের লোকদের। ঠিক সময়ে রেশন কার্ড থেকে খবরের কাগজ পর্যন্ত মেটানো। এ যে কি অসম্ভব ব্যাপার—এ বিষয়ে যাঁরই সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন।

তবুও আমরা বাড়ি বদলাই। অনেক সময় প্রয়োজনে, হয়তো কদাচিৎ এমনি এমনিই। বাসা বদলানোর একটা আলাদা ধরনের স্বাদ আছে; প্রায় বিদেশ ভ্রমণের মত। নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে চারপাশে অচেনা প্রতিবেশী, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট একটু অন্য রকম। যে যাই বলুক নতুন বাড়ির কিছু আনন্দ আছে।

কিন্তু তার আগে খুব সাবধানে লরিতে করে কাঁচের পুরানো আলমারি নিয়ে আসতে হবে এবং এত সাবধানতার মধ্যেও একটা কাঁচ হয়তো সত্যিই ভেঙে যাবে, হারিয়ে যাবে দু-একটা খুচরো জিনিস, অনেক বিবেচনার পর ফেলে আসতে হবে ব্যবহার করলেও করা যেতে পারতো এমন দু-একটা সামগ্রী। তাও শেষ নয়। বাসা বদলানোর

অনেক দায়।

পোষ্টাফিসে ঠিকানা বদল জানাতে হবে বলতে হবে নতুন ঠিকানায় সব চিঠি পত্র,পার্শেল-মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিতে। নতুন ঠিকানা আত্মীয়দের, বন্ধুবান্ধবদের জানাতে হবে।

তবু সবাই জানাবে না। দু-একটা চিঠি চিরকালই পুরনো ঠিকানায় চলে যায়, সেখানে গিয়ে চুপচাপ আরেকজনের ডাক-বাক্সে গোপনে ঢুকে পড়ে আর বেরোবার পথ পায় না। দু-একজন লোক আট-দশ বছর পরেও হঠাৎ কেন যেন পুরানো ঠিকানায় গিয়ে কড়া নাড়ে, 'অমুক বাবু বাড়ি আছেন? বর্তমান অধিবাসীরা একটু অবাক হয়, শুধু পাশের বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে বলেন, ওরা তো অনেকদিন হলো এ পাড়া ছেড়ে চলে গেছে।

কড়া নাড়ার শব্দে হয়তো এতদিন পরে আবার দু-একজন পুরানো পড়শির, যারা দশ বছর হলো চলে গেছে সেই তাদের কথা নতুন করে মনে পড়ে, 'সেই তাদের ছোটো ছেলেটি ছিলো, বারান্দায় একা একা খেলতো, সে এতদিনে নিশ্চয় অনেক বড় হয়েছে।

একবার পুরানো বাড়ি ছেড়ে গেলে আর সেই পাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম লোকই রক্ষা করতে পারে। যে রাস্তায় একটা টিউবওয়েল বসানোর জন্যে দশবার দশ জায়গায় দরবারে গেছি, প্রাণান্ত করে ছেড়েছি, সেই কলের জল গত এগারো বছর খাওয়া হয় নি। মধ্যে মধ্যে সেখানকার দু-একজনের সঙ্গে রাস্তায়, ট্রামে-বাসে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় হঠাৎ কখনো একটা মৃত্যু সংবাদ, একটা বিয়ের খবর।

আর? দু-এক খণ্ড নাতিশীতোষ্ণ স্মৃতি। দরজায় বহুদিন আগের কোনো এক বালকের হিজিবিজি সই, এতদিনে খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই কিন্তু চেষ্টা করলে পড়া যাবে না এমন নয়।

ছুটি

এই শতাব্দী শেষ হতে তখন আর মাত্র কয়েক বছর বাকি রয়েছে, মহাকালের অরণ্যে কুড়ি নম্বর গাছটির শেষ কয়েকটি জীর্ণ পাতা তখন শীতের প্রথম বাতাসে থির থির করে কাঁপছে। নভেম্বর মাস, সন্ধ্যাবেলায় কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের নিচে বড় বাড়িটার সবচেয়ে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক ক্লান্ত ভদ্রলোক লালদীঘির রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, ঠিক আজকেই আটান্ন বছর বয়েস পূর্ণ হলো তাঁর, জীবনের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ, পঁয়ত্রিশ বছর সময় ঐ বাড়িটায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে কেটে গেলো। আজ থেকে তাঁর ছুটি, অবসর।

গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভদ্রলোক শুধুই দিন গুনেছেন, একেকবার ভেবেছেন অসময়ে অবসর নিয়ে নেবেন, একেকবার ভেবেছেন লম্বা ছুটি নেবেন; দিনের পর দিন চলে গেছে অফিস-বাড়ি-অফিস। মধ্যে এক-আধদিন ছুটি, রবিবার, কদাচিৎ ছুটো ক্যাজুয়েল। জি-পি-ও-র গম্বুজের ছায়া ছোট হতে হতে বড় হয়েছে, আবার ছোট হয়েছে। লালদীঘির পুকুর পাড়ে কি একটা বিদেশী গাছ, এই পঁয়ত্রিশ বছরেও যে গাছটার নাম জানা হলো না, সেই গাছটা চৈত্রমাসের বিকেলবেলায় গন্ধে, ফুলে, রঙে, আলোর কি ভীষণ হৈচৈ করেছে বছরের পর বছর। দিন চলে গেছে, শুধু-শুধুই। কাজ, অকাজ, আরো কাজ কিছুটা দায়িত্ব, কিছুটা ঝোঁক, কিছুটা নিজের বোকামি ভদ্রলোক ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছেন ফাইলের জংলি ঝোপে, কিছুতেই কাঁটা ছিড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, ভালো করে ছুটি নেওয়া হয়নি জীবনে। এরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে জীবনের বড় বড় ব্যাপার ঘটেছে, জন্ম-মৃত্যু-পরিণয়, শিশু সাবালক হয়েছে, বাসা বদল হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। কত প্রাণের

বন্ধু রক্তের আত্মীয় চির-বিচ্ছেদের অনন্ত প্রসেশনে ভরে গেছে স্মৃতি।

ক্লান্ত ভদ্রলোক পথে নেমে একবার পরম মমতার ছেড়ে আসা বাড়িটার দিকে তাকালেন, ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর জীবন জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কত কি বদলিয়ে গেলো, আরো কত কি কিছুতেই বদলালো না। এই তো লালদীঘি, এখন আর কয়জন জানে আগে এর নাম ছিলো ডালহৌসি স্কোয়ার। বি-বা-দী বাগ যখন নাম হয়, সে'ও প্রায় ত্রিশ বছর, ভদ্রলোকের পুরনো কথা মনে করে একটু হাসি পেলো, তিনি ধরে নিয়েছিলেন নামটা চলবে না, কিন্তু চমৎকার চলে গেলো, এখন একেবারে পাকা হয়ে গেছে।

সামনে স্মৃতিচিহ্নের মতো জি-পি-ও'র গম্বুজটা এখনো আছে, কিন্তু পুরনো ঘড়িটা নেই, সে জায়গায় একটা বিদ্যুৎঘড়িতে লাল-নীল আলোয় সময়ের অঙ্ক জ্বলজ্বল করছে। দূরে টেলিফোনের নতুন বাড়িটা করে পুরনো হয়ে গেছে, অনেক দূরে এখন নতুন টেলিফোন ভবন, এই বাড়িটা আজকাল লোকে পুরনো অফিস বলেই চেনে।

ভদ্রলোক রাস্তার এসকেলেটরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন, এখান থেকে এসকেলেটার ময়দান পর্যন্ত গিয়ে বাড়ি যাওয়ার টিউব পাওয়া যাবে, একেবারে চার লাফে লবণহ্রদ। কিন্তু বহুদিন পরে আজ তাঁর ছুটি বহু কষ্টের ছুটি, বহু পরিশ্রমের অবসর। তিনি আজ কিছুতেই বাড়ি ফিরবেন না। বন্ধুদের একটু খুঁজতে হবে, পঁয়ত্রিশ বছর ভালো করে মেলামেশা করা হয়নি। একটু হৈ-হল্লা করতে হবে, অনেকদিন ভালো করে হৈ-হল্লা করা হয়নি। কে যে কোথায় আছে এখন? দু-একজন এত নাম করেছে যে খবর না রেখে উপায় নেই, আরো দু-একজনের খবরও কিছু কিছু রাখেন তিনি, কিন্তু বাকিরা, আর সবাই এখন কোথায়? কেউ কেউ অবশ্য খুব দূরে একেবারে নতুন ঠিকানায় চলে গেছে। কিন্তু বাকিদের খোঁজ নিতে হবে।

একবার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সেই পুরানো চায়ের দোকানটার যেতে হবে, একবার কফিহাউসে। দেখতে হবে জায়গাগুলো এখনো বেঁচেবর্তে আছে কিনা, কোনো প্রবীণ মুখ চেনা-চেনা মনে হয় কিনা।

আর ধর্মতলার কাছে সেই গোলমেলে সন্ধ্যায় আড্ডাটা, সেখানেও একবার যেতে হবে, কতকাল যাই-যাই করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ভদ্রলোক এসকেলেটরের মুখ ছেড়ে হাঁটাপথে লালদীঘির পূবদিকে রওনা হলেন, ওখানে একটা পান বিড়ির দোকান আছে। কুড়ি বছর আগে সিগারেট-জর্দা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। আজ অনেকদিন পরে একটা গুণ্ডি-মোহিনী পান খাবেন, আর একটা সিগারেট-ও খাবেন। সিগারেটটা দোকানের ধারে নারকেল-দড়ির আগুন থেকেই ধরাবেন। এখন অফিস ছুটির সময়, তাঁর ছেড়ে আসা অফিসের ছেলেরা কেউ যদি তাঁকে এইভাবে সিগারেট ধরাতে দেখে একটু অবাক হবে বোধ হয়, তা হোক। তাঁর আর কিছু আসে যায় না। তাঁর আজ থেকে ছুটি, অনেক অনেকদিন গোলমাল করা হয়নি, হৈ-হল্লা করা হয়নি।

হলুদ পানজাবি

একটা হলুদ পানজাবি ছিলো আমার। অমন গাঢ় হলুদ রঙ কদাচিৎ চোখে পড়ে। রোদের মধ্যে বেরোলে প্রায় চোখ ঝলসে যাওয়ার মত ঘন হলুদ রঙ।

অনেকদিন আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসবে গিয়ে চারদিকে হলুদ ও গেরুয়ার ছড়াছড়ি দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিলো ঐ রকম রঙের একটা পানজাবি বানানোর।

হাওড়া স্টেশন দিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই এসপ্ল্যানেডের মোড়ে নেমে পড়ি। এখন যেখানে ট্যাকসি এ্যাসোসিয়েশনের স্ট্যানড তখন ওখানে একটা বড় হকারস করনার ছিলো। সাধারণত কোনো দোকানে চট করে হলুদ রঙের পানজাবি কাপড় পাওয়া যাবে না। এটা আমি বুঝেছিলাম। তখনো চারপাশে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এতো রঙীন জামাকাপড়ের ব্যবহার সুরু হয় নি। তাই বুদ্ধি

করেই আমি ঐ হকারস করনারে ঢুকেছিলাম কারণ ঐ বাজারে অনেক দেশোয়ালি খরিদ্দার যারা এই রকম সব গাঢ় রঙের পানজাবি গায় দেয়।

খুব সহজেই পেয়ে গেলাম পানজাবির কাপড়, দামও বলতে গেলে বিশেষ কিছু নয়, পাঁচসিকে কী বড়জোর বোধহয় দেড় টাকা করে গজ পড়েছিলো। কাপড় কেনার পর ঠিক করলাম এই বাজারেই পানজাবি বানিয়ে নিই। কারণ আমি সাধারণতঃ যে দরজির কাছে জামা-কাপড় বানাই সে আমার নিজের জন্য এই রকম একটা ক্যাটক্যাটে রঙের পানজাবির কাপড় কিনেছি দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে। অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে তার ঘাবড়ানোর কোনো কারণ ছিলো না, কিন্তু চিরকালই এই ধরনের নানা ছোট ছোট সঙ্কোচ আমার মনের মধ্যে কাজ করে।

তিন-চার দিন পরে তৈরি পানজাবিটা হাতে পেলাম। হিন্দী খবরের কাগজের মোড়কে জড়ানো। পানজাবিটা বাসায় গিয়ে খুলে বের করা মাত্র বুঝতে পারলাম, এটা গায় দিয়ে আমার পক্ষে রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব। প্রথমে রঙটা দেখে সবটা অনুমান করা যায় নি। এখন জামা বানানোর পর বুঝলাম কী অসম্ভব একটা পোষাক তৈরি করছি।

তবু যত্ন করে পানজাবিটা বাকসে তুলে রাখলাম। মনে মনে ঠিক করলাম সময় ও সুযোগ মত বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পানজাবিটা গায়ে দেবো।

কিন্তু সেই সময় আর সুযোগ কিছুতেই আসে না। এক বছর কেটে গেলো। পরের বছর দোলের দিন চারদিকে রঙের মাখামাখি দেখে পানজাবিটার কথা মনে পড়লো। বাকসো খুলে বের করলাম। স্থির করলাম আজ বিকেলে অবশ্য-অবশ্যই এটা গায়ে দিয়ে বেরোবো। বিকেলবেলা যেন যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছি এই রকম মনোভাব নিয়ে পানজাবিটা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পাড়ায় দু-একটা কৌতূহলী দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম যতটা ভেবে-ছিলাম তা নয়; আমার এই বর্ণের উৎকর্ষে জনসাধারণ খুব উত্তেজিত হয় নি।

মোড়ের মাথায় দুএকজন চেনা শোনা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, তারা সমাস্বরে আমাকে সম্বর্ধনা জানালো, 'ব্রিলিয়ানট জামা হয়েছে।

প্রথমবারের সঙ্কোচ কেটে গেলো বটে, কিন্তু অস্বস্তি গেলো না। যতবারই হলুদ পানজাবিটা গায়ে দেব বলে বাকসো থেকে বের করি, গায়ে দিয়ে আবার একটু পরে ছেড়ে রেখে অন্য জামা পরে বেরোই। কিন্তু এক রবিবার দুপুর বেলায় এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ, ভাবলাম বন্ধুর বাড়িতেই যখন যাচ্ছি এটা পরেই যাওয়া যায়। নামা মাত্র বন্ধুপত্নী প্রায় আঁৎকে উঠলেন, কী সাংঘাতিক কথা! এটা কী পরেছেন? আপনাকে তো আমরা নেমন্তন্ন করিনি, আমরা যাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আপনি বোধহয় তিনি নন। বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। একবারের জন্যেও আমাকে সমর্থন জানালেন না।

তারপর দীর্ঘকাল চলে গেছে। সেই বন্ধুপত্নী আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন। পানজাবিটাও আর তৃতীয় বার গায়ে দেওয়া হয় নি। প্রায় নতুন অবস্থায় বাকসের এক কোণায় ফেলে রেখেছিলাম।

মধ্যে আমাদের সংসারে খুব টানাটানি অনটন। সব পুরানো জামা ছিঁড়ে গেছে নতুনও বানানো হচ্ছে না। এই সময় একদিন পানজাবিটা হঠাৎ নজরে পড়লো। ভাবলাম আজকাল তো সবাই খুব রঙিন জামা কাপড় ব্যবহার করছে, আমি একটা হলুদ পানজাবি গায়ে দিলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

বের করে দেখলাম, কোথাও ছেঁড়ে-ফাটে নি, শুধু বহুদিনের অব্যবহারে কুঁচকিয়ে ময়লা হয়ে আছে। ধোপাকে কাচতে দিলাম। ফিরে এলে আর চিনতে পারি না। রঙটা খুব কাঁচা ছিলো, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে কেচে একেবারে সাদা করে দিয়েছে।

এখন সেই পানজাবিটা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করছি। কেউ বুঝতে পারে না তাকিয়েও দেখে না, এমন কি আমার নিজেরও একেক সময় খেয়াল থাকে না যে আমি একটা হলুদ পানজাবি গায়ে দিয়ে রয়েছি।

লর্ড ক্রিকেটেশ্বর

লর্ড: ক্রিকেটেশ্বর নামে এই রচনাটি পুজোর মন্ত্র নিয়ে না ক্রিকেট নিয়ে সেটা পাঠকেরা বিবেচনা করবেন। প্রথমে মন্ত্রটা বলে নিই,

'আম্র চুরি জাম্র চুরি
ভাদ্র মাসে ধান্য চুরি
মন্দস্থানে রাত্রিযাপন
মদ্যপান আর কুঁকড়া ভক্ষণ
ইত্যস্য পাপ বিমোচন, গঙ্গা গঙ্গা।'

উপরের আশ্চর্য মন্ত্রটি আমার রচনা নয়। বস্তুত এই মন্ত্রটি সম্ভবত অনেকেরই বিশেষ পরিচিত। গঙ্গার ঘাটে পুরোহিত ঠাকুরেরা এই পাপ বিমোচন মন্ত্রটি নাকি পুণ্যার্থীদের দিয়ে বলান। এ বিষয়ে অবশ্য আমার কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। এর উল্লেখ আছে মহামতি পরশুরামের 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প' বইতে ধনুমামার হাসি নামক বিখ্যাত গল্পে। প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমরা কলেজে পড়ি, গল্পটি প্রথম বেরিয়েছিলো এই আনন্দবাজার পত্রিকার একটা শারদীয়া সংখ্যায়। অথবা দেশ শারদীয়া সংখ্যাও হতে পারে। সে যা হোক, তখনই মন্ত্রটি পড়ে মুগ্ধ হই, সেই অল্প বয়েসের মুগ্ধতায় মন্ত্রটি মুখস্থ হয়ে মনে গেঁথে আছে। কত কি যে ভুলেছি জীবনে। ব্রাহ্মণ সন্তান' বেশ ঘটা করে উপনয়ন হয়েছিলো, আমার সেই গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত ভুলতে বসেছি, কিন্তু এই আম্র চুরি, জাম্র চুরি···গঙ্গা, গঙ্গা' পুরোপুরি রীতিমত ঝরঝরে মনে রয়েছে।

জনমানস বড় দুর্বল বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া স্বভাব তার। তবু আশা করি উনিশশো তিরাশির পঁচিশ-ছাব্বিশ জুন তারিখটি পাঠকপাঠিকারা এত তড়াতাড়ি বিস্মৃত হননি, খুব তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হবেন না।

পঁচিশে জুন মধ্যরাত বরাবর আমাদের ছেলেরা হেলায় বিশ্ব করিল জয়। বিজয় উল্লাসে এই মরনগরী উচ্ছল হয়ে উঠলো। আলো-

বাজি-পটকা- মিছিল-ব্যাণ্ডপাটিতে তরঙ্গিত হয়ে উঠলো জনজীবন। সেই সাত হাজার মাইল দূরে লরডসের মাঠে বিবিসি-তে ঘোষক পর্যন্ত টের পেলেন, তার কানে কি করে পৌছালো এই উৎসবের কলধ্বনি। তিনি বললেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছি কলকাতার অশ্বিনী দত্তের গলিতে এতক্ষণ আনন্দ উৎসব, বাজি-বাজনা শুরু হয়ে গেছে। পণ্ডিতিয়া, অশ্বিনী দত্তের গলির ঐ পাড়ায় এক যুগ ছিলাম, বি বি সির অনুমান শুনে গর্বে, অহঙ্কারে আমার বুক ফুলে উঠলো।

ঐ পণ্ডিতিয়ার রাস্তায়, শীতের কোনো কোনো কবোষ্ণ রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে বা মধ্যাহ্নে এই যে সামান্য আমি, এই আমিও কখনো কখনো ব্যাট ধরেছি, বল করেছি। আজকাল বাজারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই রকম স্বাবলম্বী উইকেট পাওয়া যাচ্ছে বাঁধানো রাস্তার উপরে বা ফুটপাথে খেলার জন্য। আমাদের ছোট বয়েসে এমন ছিলো না। পরপর বারোটা ইট সাজালে ছত্রিশ ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি উইকেট হতো। বোলড আউট হলেই ইটগুলো একের পর এক উইকেট থেকে নিচে পড়তে থাকতো, কত উইকেটকিপারের পায়ের পাতা থেঁতলে গেছে ঐ ইটের পতনে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে, পথ-ক্রিকেটে ঐ উইকেটকীপার প্রথাটা উঠে গেলো। দেয়ালে তিনটে স্টাম্প এঁকে দেয়া হলো, ব্যাটধারীর পিছনের দেয়ালই প্রস্তরীভূত উইকেট-কিপার। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বড় গোলমাল শুরু হলো। ব্যাপারটা চাক্ষুষ, তাই যারা ব্যাট করছে তারা বলছে বল উইকেটে লাগেনি, যারা বল করছে তারা বলছে মধ্যের স্টাম্প উড়িয়ে দিয়েছে। প্রমাণের অভাবে রীতিমত গোলমাল, হৈচৈ, মারামারি। অবশ্য এর একটা সমাধান অচিরেই আবিষ্কৃত হলো যে, বল করার আগে প্রত্যেকবার বালতির জলে বলটি চুবিয়ে নিতে হবে। বালতিটা থাকবে উল্টোদিকের উইকেটের পাশে, ভেজা বলের নিশ্চিত ছাপ পড়বে উইকেটের দেয়ালে এবং স্পষ্টই বোঝা যাবে আউট না নট আউট।

অবশ্য ক্রিকেট সম্পর্কে এত কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। অল্প বয়েসে অন্য এক পাড়ায় আমরা ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম। টসে

জিতে আমরা ব্যাট করতে নামি, ব্যাটিং পর্যায়ে আমি ছিলাম একাদশ স্থানে. তিন রানে আমাদের নয়টি উইকেট পড়ে যায়, বেগতিক দেখে আমার দলের সমস্ত খেলোয়াড়, শুধু আমি ও দশম ব্যাটসম্যান বাদে, কারণ আমরা তখন উইকেটে, পালিয়ে চলে যায়। বিপক্ষ দল কিন্তু আমাদের দুজনকে আটকিয়ে দেয়, বলে ফিলডিং শোধ দিয়ে যেতে হবে। আমরা মাত্র দুজন, কি ফিলডিং শোধ দেবো? অনেক কাঁদাকাটি করলাম, হাতে পায়ে ধরলাম। শেষে বিপক্ষ দল নির্দেশ দিলো উইকেটের এ মাথা থেকে ও মাথা নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে আর ক্রিকেট খেলবো না, ক্রিকেট খেলা দেখবো না, ক্রিকেট নিয়ে কথা বলবো না। কি আর করবো, নাকে খত দিয়ে শপথ নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আশা করি পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই বিপক্ষ দলের কেউ এই লেখাটি পড়ছেন না। ক্রিকেটের এই আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, পরশুরামের মন্ত্র দিয়ে। এবার সেখানে ফিরে যেতে হয়।

আমি এখন যে বেপাড়ায় থাকি পঁচিশে জুনের ঐ মধ্যরাতে লণ্ডনের ঘোষকের মতো আমিও বুঝতে পারলাম আমার নিজের পাড়া এতক্ষণে আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

পুরনো পাড়ায় পৌঁছে দেখি রীতিমত প্যাণ্ডেল করে ব্যাট আর বলের পুজো হচ্ছে। বলটি আর ব্যাটটি আগাগোড়া চন্দন আর সিন্দুরচর্চিত। ঠিকমত ধুপধুনো, ঘন্টা বাজিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো হচ্ছে। পুরোহিত ঠাকুর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজোয় যেমন, একবারে হুবহু তাই। সামনের বারকোষে কলা, নৈবেদ্য, ফলমূল প্রসাদ। মাইকে উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীস্তোত্র বাজছে। কাছে গিয়ে দেখি প্যাণ্ডেলের ভিতরে রীতিমত জমজমাট। খেলোয়াড়দের বড় বড় ছবি, ছবির গলায় মালা, তিনদিকের লালশালু জুড়ে ব্যাট, বল, উইকেটের ফটো, কাগজের রিপোর্টের কোলাজ, সবচেয়ে পিছনে বড় বড় করে সাদা কাগজের হরফে লেখা আছে,

বলং বলং ব্যাট বলং।

হস্তে হস্তে ফলং ফলং॥

তখনো সাজসজ্জা শেষ হয়নি, একটি মাদ্রাজি ছেলে গোটা ইংরেজি অক্ষরে দেবতার নাম রঙিন কাগজ কেটে বানিয়ে এনেছে, মণ্ডপের সামনে টাঙাবে,

OM LORD CR'CKTESWAR.

ভেবে দেখলাম এ আর আশ্চর্য কি, মহামান্য হাইকোর্টে পর্য্যন্ত হাইকোর্টেশ্বরের মন্দির হয়েছে। বাদী, প্রতিবাদী, উকিল-ব্যারিস্টার সবাই সেখানে পূজো দেয়।

পূজো শেষ, অঞ্জলির সময় হলো। পুরুত ঠাকুর সকলকে ফুল-বেলপাতা এগিয়ে দিচ্ছেন। সকলের সঙ্গে আমিও ভক্তিভরে হাত এগিয়ে দিলাম। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন…'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ক্রিকেটশ্বরায় নমঃ নমঃ।

অঞ্জলি দিতে দিতে অনেকদিন আগের সেই পরশুরামের মন্ত্রের কথা মনে পড়লো,

'হক্কল পাপ বিমোচন গঙ্গা গঙ্গা।'

শীলাকে ভালবাসি

আমি শীলাকে ভালবাসি। আই লাভ শীলা—জীবনের প্রেমের পাঠ আমার সেই প্রথম। তখন আমার বয়েস কতো হবে বারো, বড় জোর তেরো। মফঃস্বলের হাই ইংলিশ স্কুলের ক্লাস এইটে পড়ি।

কোনো শিক্ষক কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে যজ্ঞডুমুর এই বলে সম্বোধন করতেন। যজ্ঞেশ্বর আমার এবং ক্লাসের অধিকাংশের চেয়ে অন্ততঃ সাত বছরের বড় ছিলো। সবচেয়ে আগে, বেয়ারারা ঘর ঝাঁট দেবারও অনেক আগে সে স্কুলে এসে পৌঁছাতো। আসতো সেও বেশ দূর থেকে, প্রায় তিনটে গ্রাম পাড়ি দিয়ে কামাই একেবারেই হতো না। ক্লাস পালাতো না। স্কুলে যাওয়ার পথে

বাজারের রাস্তায় অথবা কালীবাড়ির সামনে জটলায় আমাদের তাগাদা দিয়ে যেতো, 'যা, যা বাড়ি গিয়ে স্নান করগে, বেল্ পড়ে যাবে।'

আমরা সেই বয়সেই ঘড়ি দেখা বিশ্বাস করতে শিখেছিলুম। তাই এরো অনেক পরে স্নান-খাওয়া করে বেল্ বাজবার আগেই স্কুলে পৌঁছে যেতাম।

টিফিনের সময়েও ক্লাস থেকে বেরোত না যজ্ঞেশ্বর। সবচেয়ে আগে এসে ফার্স্ট বেঞ্চে ফার্স্টে বসে থাকতো সব সময়, কিছু কিছু পড়াশুনাও করতো। সেই যজ্ঞেশ্বর পরপর দশদিন অনুপস্থিত। আমি ভাবলুম শরীর খারাপ হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর আমাদের সঙ্গে প্রায় অভিভাবক সুলভ ব্যবধান রাখত। কিন্তু, এরই মধ্যে ওর সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিলো কি জানি, কেন যে সে আমাকে একটু স্নেহই করতো।

এগারো দিনের মাথায় যজ্ঞেশ্বর এলো। তাও তার যথাসময়ে নয়। বেল পড়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই এলো। উস্কো খুস্কো চুল, চোখ লাল, ময়লা জামা কাপড়। নীল ফুল সার্ট গায়ে দিতে, কোনো সময় হাতা আটকানো ছাড়া দেখিনি, আজ এলোমেলো ভাবে গোটানো।

কি হয়েছিল,অসুখ নাকি? কিন্তু হাবভাবে সেরকম কিছুই মনে হয় না। বরং কোনো বিপর্যয়, বাড়িতে কারো অসুখ বা মারা গেছে। প্রথম পিরিয়ডের পর যজ্ঞেশ্বরের কাছে গিয়ে বললাম, 'কি হয়েছে, এ কদিন এলেনা কেন?'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো যজ্ঞেশ্বর, তারপরে একটু থেমে বললো, 'ছুটির পরে থাকিস।'

ছুটির পরে কম্পাউণ্ডের বাইরে গেটের পাশে এসে দাঁড়ালাম, যজ্ঞেশ্বর পিছিয়ে পড়েছিলো এগিয়ে এসে বললো, 'বাসায় যা, বাসার থেকে ডেকে নেবো। বাসায় থাকিস।'

আধঘণ্টা পরে যজ্ঞেশ্বর আমাদের বাসায় এলো, যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ, একটু থমথমে তারপর নদীর ওপারে স্পষ্ট বনরাজিনীলার দিকে

তাকিয়ে বললে, 'তুই বুঝতে পারবি না, আর তোকে বলা উচিত হবে না।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে যোগ করলো, 'এ বয়সে তুই এসব বুঝতেও পারবি না।'

বেশি আগ্রহ দেখানো অনুচিত হবে ভেবে, আমি কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটলো। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যজ্ঞেশ্বর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আই লাভ্ শীলা,' বলে হন্‌হন্ করে হাঁটতে লাগলো, আমি যথাসম্ভব তাল রক্ষা করে তার পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর, যজ্ঞেশ্বর উঁচু একটা বালি ঢিপির ওপরে বসলো, আমিও গিয়ে বসলাম।

'আমি শীলাকে ভালোবাসি', এবার স্পষ্ট বাংলায় বললো, যজ্ঞেশ্বর, যেন বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেলো তার, একটু স্বস্তি পেলো যেন এই ভাবে বলতে পেরে। আমি আর কি বলতে পারি—চুপচাপ রইলাম।

'একটা চিঠি দিতে হবে, শীলাকে, তুই লিখে দে,' যজ্ঞেশ্বরের এই অনুরোধে একটু ঘাবড়ে গেলাম। আর তাছাড়া কে শীলা, কি ব্যাপার কিছুই জানিনা। যজ্ঞেশ্বর আবার বললো, 'শীলাকে মুখেই বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না, এডুকেটেড মেয়ে, একটা চিঠি লিখেই জানাতে হবে।'

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিলের খণ্ড বের করে বললো 'লেখ।'

কিন্তু কি লিখবো, যজ্ঞেশ্বরই উদ্ধার করলো, ডিক্টেশন দেয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'মাই ডিয়ার শীলা।' তখন আমাদের ক্লাশে বাবার কাছে ইংরেজি চিঠি লেখা সেখানো হচ্ছে। আমি বললাম,' বাবাকে তো লেখে মাই ডিয়ার ফাদার।'

যজ্ঞেশ্বর চিন্তিত হলো কি করা যায় তাহলে? আমি পরামর্শ দিলাম 'ডার্লিং সুশীলা' বলে সম্বোধন করতে, আমার কি করে ধারণা হয়েছিলো যে প্রিয়তমাই ডার্লিং। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাধা দিলো, 'আরে

না, ডার্লিং হলো বাচ্চা মেয়ে। দেখিস না, পুলিশ সাহেব তার ছোট মেয়েকে ডার্লিং বলে ডাকে?'

কি জানি? এমন সমস্যায় আর কখনো পড়িনি। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর মরীয়া। 'মুখে বলতে পারলাম না, চিঠিও লিখতে পারবো না, আমি এখন কি করি?' যজ্ঞেশ্বর উঠে দাঁড়ালো, তাহলে আমাকে আত্ম-হত্যাই করতে হবে' তার আগে আরেকবার বলি, আই লাভ শীলা।' যজ্ঞেশ্বর অবশ্য আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু এতদিনে যেন বুঝতে পারি, ভাবপ্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে কেন যজ্ঞেশ্বর আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো। এ ঘটনার পর যজ্ঞেশ্বর আর ঘরে আসেনি। প্রেমে পড়ে অথবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সে লেখাপড়া ছেড়ে দিলো। আমার অবশ্য মনে দুর্ভাবনা ছিলো, যজ্ঞেশ্বর বুঝি সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করে বসেছে। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গেও দেখা নেই, যজ্ঞেশ্বর যে গ্রামে থাকতো সে তল্লাটের বিশেষ কাউকে চিনতাম-ও না।

মাস তিনেক পরে একবার মাছ ধরতে গেছি যজ্ঞেশ্বরদের গ্রামের দিকের এক খালে, সেখানেই তার সঙ্গে আমার দেখা হলো 'কিরে, কেমন আছিস?' আমার প্রশ্নের উত্তরে ম্লান হেসে যজ্ঞেশ্বর জানালো, ভালো।

'ইস্কুলে যাসনা কেন?' যজ্ঞেশ্বর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো, বললো 'দোকান দিয়েছি।' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'মাছ মেরে ফেরার পথে বাজারটা ঘুরে যাস। দেখা হবে, সেখানেই আমার দোকান রয়েছে।'

ফেরার পথে বাজারে গিয়ে দেখলাম, এক প্রান্তে ছোট একটা মনিহারি দোকান। দোকান ছোট, কিন্তু দোকানের পক্ষে বিরাট এক সাইন বোর্ড। 'শীলা ভাণ্ডার, প্রোঃ যজ্ঞেশ্বর দাস।'

সেদিন অনেক কথা হলো কিন্তু যজ্ঞেশ্বরকে কিছুতেই শীলা সংক্রান্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করা আমার হলো না। কি একটা সঙ্কোচে পড়ে বাধা পড়লো আমার কৌতূহলে একটু পরে উঠে এলাম। কিন্তু শীলা বিষয়ে ঠিক কতদূর কি গাড়িয়েছিলো, তা আজ পর্যন্ত আমার জানা

হয় নি।

এর পর প্রায় বছর সাতেক-আটেক আমি ও যজ্ঞেশ্বর পরস্পর সম্পর্ক-শূন্য। আমি কলকাতায় পড়তে চলে এসেছি, যজ্ঞেশ্বর ওখানেই রয়ে গেছে। দু'একবার ছুটি ছাটায় বাড়ি গিয়েছি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের গ্রাম অবধি আর পৌঁছনো হয় নি।

তবু হঠাৎই আবার দেখা হয়ে গেলো। আর যজ্ঞেশ্বরের গ্রামের বাজারে নয়, এবার আমাদের শহরেরই বাজারে; বাজার করতে গেছি, ঢোকার মুখেই বাধা পেলাম। যজ্ঞেশ্বর পাশের একটা দোকান থেকে ডাকছে। 'গ্রামে ব্যবসা-পত্র চলে না, দোকান এখানেই উঠিয়ে নিয়ে এলাম,' যজ্ঞেশ্বর হেসে আমাকে বসতে বললো। বাজার থেকে ফেরার পথে আর একটু বসে গেলাম। বহুদিন পরে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে গল্প আর তেমন জমলো না। একটু দুঃখ হলো।

পরের দিন আবার বাজারে যেতে দেখলাম, যজ্ঞেশ্বরের দোকানে একটা নতুন সাইনবোর্ড তোলা হয়েছে। লাল রঙের অক্ষরে কালো জমির ওপরে মফঃস্বলী ধাচের লেখা সাইনবোর্ড, 'মনোরমা ভ্যারাইটি স্টোরস্।' কেমন কৌতূহল হলো, যজ্ঞেশ্বর কি বিয়ে করেছে? না করারও কোনো কারণ নেই, এই বয়সের মধ্যে এখানকার সমস্ত লোকই প্রায় বিয়ে করে ফেলে, যজ্ঞেশ্বরও বোধহয় করেছে, তা হলে মনোরমা ওর স্ত্রীর নাম হবে। ঐ দিনই সুযোগ বুঝে কথায় কথায় যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার দোকানের এ রকম নাম দিলে কেন? বিয়ে করেছো নাকি?'

যজ্ঞেশ্বর লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেলো, জিভ কেটে ফেললো। তারপর বললো, 'আরে না, না, ছিঃ, ছিঃ, কুমারী মেয়ের সম্পর্কে এ সব কথা বলা ভীষণ অন্যায়।' কি অন্যায়, কি ব্যাপার, কিছুই বোঝা গেলো না, কুমারীর নাম দিয়ে যদি মনিহারি দোকানের সাইনবোর্ড করানো যায় তাতে দোষ নেই। শুধু জিজ্ঞাসাতেই দোষ?

এরপর অবশ্য যজ্ঞেশ্বরের কাছ থেকে মনোরমা সংক্রান্ত বহু তথ্যই আমি জানতে পেরেছিলাম, বিনা গল্পে এবং প্রচেষ্টায়। সে নিজের

থেকেই গলগল্ করে বহু কথা বললো। মনোরমা স্থানীয় বাস-ড্রাইভারের মেয়ে, ঐ বাড়িতেই যজ্ঞেশ্বর দুপুরে ও রাতে খায় এবং সারা দিন মনে মনে মনোরমাকে প্রেম করে। মনোরমা কেমন এ্যালবার্ট করে চুল বাঁধে, মাউন্ট করা ব্লাউজ পরে, কেন যে এত আকাশী রঙের শাড়ি পরে, তবে আকাশী রঙের শাড়িতে ওকে মানায় ভালোই— যজ্ঞেশ্বরের এই রকম প্রাণখোলা আলোচনা শুনে শুনে আমার কৌতূহল অবশেষে ক্লান্ত হয়ে গেলো। মনোরমা ভ্যারাইটি স্টোরসের পর আরো বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। যজ্ঞেশ্বর সম্পর্কে প্রায় ভুলেই এসেছি। এমন সময় আবার হঠাৎই অপ্রত্যাশিত দেখা হয়ে গেলো। দমদমের দিকে একটা বাসস্টপে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আচমকা যজ্ঞেশ্বর আমাকে জড়িয়ে ধরলো, 'এই তুই এখানে কি করছিস।' এতকাল পরে যদিও চিনতে আমায় অসুবিধেই হচ্ছিল; তবু যজ্ঞেশ্বরের কথা বলার ভঙ্গিতে ধরে ফেললাম। বললাম, কি ব্যাপার তুমি এখানে এলে কোথা থেকে?' 'দেশে কি আর কেউ আছে, চলে এলাম, ঐ গলির মধ্যে চায়ের দোকান দিয়েছি, একদিন আসিস।'

সেদিন চলে এলাম। কিন্তু ও পাড়ায় মাঝে মধ্যেই যেতে হয়, পরে একদিন খুঁজে যজ্ঞেশ্বরের দোকানে গেলাম। কাঠের বেঞ্চি পাতা ছোট, অতি দরিদ্র রেঁস্তোরা কিন্তু বাইরে আবার সেই ব্যাপার। ঝকঝকে সাইনবোর্ডে, দু'পাশে আঙুরের থোকার ছবি ঝুলছে মধ্যে রক্তের অক্ষরে লেখা, লতা রেষ্টুরেন্ট।'

এখন আর তত কৌতূহল নেই। লতাপাতা ঘটিত কোন ব্যাপারে কিছু না জেনে শুধু যজ্ঞেশ্বর এখনো বিয়ে করতে পেরে উঠেছে কিনা এই সামান্য জিজ্ঞাসা আমার। ঈশ্বর সহায়। যজ্ঞেশ্বর দোকানে নেই। একটা বাচ্চা বয় রয়েছে, এক ভাঁড় চা নিয়ে খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই তোর বাবু কোথা থাকে রে?'

'এই কাছেই।' ছেলেটি নির্বিকার ভাবে যেদিকে আঙুল নির্দেশ করলো সেদিকে বহুদূর পর্যন্ত গরুর খাটাল।

আরেকটা প্রশ্ন তবুও বাকি ছিলো, 'তোর বাবুর বৌ কোথায়?

এখানেই আছে না দেশে ?,

'বৌ আবার কোথায় বাবুর, বৌ থাকলে কি রাতদিন দোকান ফেলে ঘুরে বেড়ায়।' দশ বছরের ছেলে অত্যন্ত প্রাজ্ঞের মত মৃদু হেসে আমার চায়ের ফাঁকা হয়ে যাওয়া ভাঁড়টা টেবিল থেকে তুলে সামনের কাঁচা নর্দমায় ফেলে দিলো।

যজ্ঞেশ্বর-কাহিনীর আর সামান্য একটু বাকি আছে। মাস ছয়েক আগের কথা. সেদিন কালীঘাট বাজারে গিয়েছিলাম, মাসকাবারি বাজার করতে, এক-আধদিন যাই। বাজারে ঢুকবার পথে একটা সাইনবোর্ডের তৈরীর দোকান, কি করে নজরে পড়লো একটা নতুন সাইনবোর্ড লেখা হচ্ছে। সেই রক্তের অক্ষরে, 'দশ মহাবিদ্যা ভাণ্ডার —প্রোঃ যজ্ঞেশ্বর দাস।'

কালীঘাট ভাণ্ডারেরই একটা ছোট দোকানের পাশে দেখি সেই সাইন বোর্ড। দূর থেকে উঁকি দিয়ে, দেখেছি, ভেতরে যজ্ঞেশ্বরই বসে আছে। ভেতরে আর যাইনি।

অনুমান করি, এতদিনে দশ মহাবিদ্যার শিক্ষা তার সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরাণ যাহা চায়

আগে এমন হতো না। যতো বয়েস বাড়ছে, গৌরনাথের মেজাজ ততো চড়া হচ্ছে। গৌরনাথ সান্যাল রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে। সিনেমায়, বেতারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, দেশের ঘরে ঘরে গত পঁচিশ বছর ধরে সেই মধুর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়েছে।

যারা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে তারা বিশ্বাসই করতে পারবে না, আজ সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে তাদের প্রিয় গায়ক গৌরনাথ সান্যাল আশি বৎসরের বুড়ো অম্বলের রোগীর মত এমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়েছে। জীবনে আর কিছুতে সুখ নেই গৌরনাথের। ধপধপে কাচা

পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবীতে না, গোল্ড ফ্লেক সিগারেটে না, এমন কি আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা কেউ একটা কাঁঠালি চাঁপা ফুল এনে দিলেও আর তত সুখী হন না গৌরনাথ। অথচ আগে কি যে ভালো লাগতো এই সব, আজকাল সব বিস্বাদ হয়ে গেছে।

গৌরনাথের মেজাজ সপ্তমে ওঠে যখন গান, সুর কিংবা লয়ের ব্যাপারে কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে। কত সঙ্গীত-সভা থেকে তিনি উঠে এসেছেন, কত চিত্রপরিচালকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, রেকর্ড কোম্পানীর কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দিয়েছেন এই সব ছোটোখাটো কারণে, অবশ্য কারণগুলো গৌরনাথের কাছে মোটেই সামান্য বা ছোটোখাটো নয়। তবু গৌরনাথের বাজার দর পড়েনি, বরং দিনে দিনে বেড়ে গেছে, বোধ হয় তাঁর মধুর কণ্ঠ আর সুরজ্ঞানকে এই জন্যে দায়ী করা যেতে পারে।

পাশের ফ্ল্যাটে, গৌরনাথ রাত্রিতে বাসায় ফেরার সময় লক্ষ্য করলেন, তালা পড়েছে। চলে গেছে, একেবারে পাকাপাকি চলে গেছে?···মনে মনে একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন গৌরনাথ। বাঁচা গেলো, দরজার পাশে এক ঘর এ্যাডমায়ারার আর রাতদিন সেই সব ভয়ঙ্কর সুরের গান, তাঁর টিয়া পাখিটা তো মরেই গেলো··· বাঁচা গেছে। আজ ক'দিন হলো কথাটা শুনছিলেন। ওরাই কে বলছিলো, 'আমরা চলে যাচ্ছি, গৌরবাবু।' গৌরবাবু 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বলে মনে মনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

অনেকদিন পরে বেশ শান্তির সঙ্গে ঘুম হলো গৌরনাথের। এই সন্ধ্যাতেই এক গানের আসরে গিয়েছিলেন সেখানে একটা মোটা মতো মেয়ে যা বেসুরো গলায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গানটি, 'আমার কি বেদনা সে কি জান', গাইছিলো। সারারাত ঘুম না হওয়ারই কথা। পুরো একটা লাইনই মেয়েটা গাইতে গাইতে ঘুলিয়ে ফেললো, শব্দ-সুর সব ওলোট-পালোট হয়ে গেলো। পাশের বাড়ীর আপদ বিদায় হয়েছে এই এক স্বস্তি না হলে মেয়েটাকে একটা টেনে থাপ্পড় কষানো হয়নি এই জ্বালায় সারারাত ডান হাত টন্ টন্ করতো, বিছানায় এপাশ

ওপাশ করতে হতো।

পরদিন সকালেই কিন্তু আরেক গোলমাল হলো। রামমনোহর দুবের সঙ্গে চিরদিনের মতো সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেলো। অনেক দিনের পরিচয় সিনেমার কারবারী রামমনোহরের সঙ্গে, অনেক অত্যাচার সয়েছেন রামমনোহর দুবের, অবশ্য দুবে তার বিনিময়ে টাকাও দিয়েছে, কিন্তু আর নয়। এবার একটা স্ক্রিপ্ট এনে দিয়েছিলো। দুবে বলেছিলো দু'টো জায়গা বেছে রবীন্দ্রনাথের দু'টো জুতসই গান লাগিয়ে দিতে হবে আর তার পরিচালনাও করতে হবে গৌরনাথকে।

গৌরনাথ রাজি হয়েছিলেন। স্ক্রিপ্টটা পড়ে তাঁর বিশেষ পছন্দ হয় নি। তবু ওর মধ্যে দু'টো লাগসই জায়গা বেছে নিলেন। যেখানে নায়িকা ধাত্রীবিদ্যা শিখতে সুইজারল্যাণ্ড চলে যাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক, এলোমেলো চুলে, দমদম এরোড্রোমে ধাবমান এরোপ্লেনের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, প্লেনের ক্ষীণ শব্দ মিলিয়ে যাওয়া মাত্র গান শুরু হবে, 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।' রামমনোহর দুবের সঙ্গে ঝগড়া হলো এই গানটা নিয়েই, ঝগড়া থেকে প্রায় হাতাহাতি বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া পর্যন্ত।

একটু পরে ধীর মস্তিষ্কে ভেবে দেখলেন গৌরনাথ, রামমনোহরের বাস্তবিক খুব দোষ ছিল না। রামমনোহর বলেছিল, 'দেখিয়ে গৌরবাবু, আপনাদের সহিত মিলিয়ে মিশিয়ে হামিও বাঙলা বেশ জানিয়ে গেছি। গুরুদেবের এ গানটা তো সুবিধা হোলো না। কি রকম যেনো গোল-মেলে হোয়ে গেলো।'

'কিসে গোলমেলে। বিস্মিত বোধ করেছিলেন গৌরনাথ।

'এই দেখুন একদফা দিলে হোলো আবার প্রাণে কেনো?' রামমনোহর হাসতে হাসতে বলেছিলো।

একটু পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গৌরনাথ দুবেকে বুঝিয়েছিলেন হিন্দি 'দিলে' অর্থ যাই হোক এখানে দিলে আর প্রাণে এক নয়?

কিন্তু গোলমাল এতে মিটলো না, এমনিই মেজাজ চড়ে গিয়েছিলো। পরের গানে 'ফাগুনের ফুল গেছে ঝরিয়া' শোনামাত্র দুবে আপত্তি

জানালো।

'মালতী তো (মালতী কাহিনীর নায়িকার নাম) সুইজারল্যাণ্ড গিয়েলো আপনি ঝরিয়া গাইবেন কেনো, উটা সুইজারল্যাণ্ড করা যায় কি না?'

'না, যায় না; বেরোন, বেরোন বলছি, এক্ষুনি। বলাই, বলাই।'

বলাই নামে চাকরকে আর ডাকতে হয়নি, গৌরনাথের, তার আগেই রামমনোহর গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেছে;

'দেখে লিবো, এ পাগলামি কোতোদিনে যায়।'

গৌরনাথের একটু অনুশোচনাই হলো, না কাজটা ভালো হয়নি। রামমনোহর লোকটা যে খুব খারাপ তাতো নয়।

এর মধ্যে সিঁড়িতে খটখট দুমদাম শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে খাট, চেয়ার, টেবিল কারা সব তুলছে। পাশের ফ্ল্যাটে বোধ হয় নতুন ভাড়াটেরা এলো। কলকাতা সহরে একদিনও বাড়ী পড়ে থাকে না, একদিনের জন্যেও শান্তি মেলে না। গৌরনাথের ঘরের পর্দাটা হাওয়ায় উড়েছিলো, তারই ফাঁক দিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করলেন একটি সুদর্শন যুবা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জিনিষপত্র খবরদারি করছে। ভেতরে ঘরের মধ্যে একটি ইতস্তত সঞ্চারমানা শাড়ির আঁচলও নজরে পড়লো। ছেলেটির সাজসজ্জা দেখে মনে হলো সদ্য বিয়ে করেছে, জিনিসপত্র যা ঘরের মধ্যে যাচ্ছে সবই নতুন, মেসবাড়ী থেকে ফ্ল্যাটবাড়ীতে উঠে এলে যা হয়। একনজর মেয়েটিকেও দেখতে পেলেন; ঠিক তাই, চোখে মুখে শুভ-পরিণয়ের সদ্য সিঁদুর।

একটু ভয়টা কাটলো। না বাচ্চাকাচ্চা কিছু নেই। হারমনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবার মতো কাউকে মনে হচ্ছে না। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন বাদ্যযন্ত্র কিছু ওঠে কিনা মালপত্রের সঙ্গে। না নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গৌরনাথ, একটু উদাসও হলেন, এই সাতচল্লিশ বৎসর বয়সেও নবদম্পতি দেখলে বুকটা একবার হুহু করে ওঠে, সারাজীবন ধরে প্রেমের গান গেয়েছেন ব্যাচিলার গৌরনাথ। সত্যি পাকা, কনফার্মড ব্যাচিলার বলে সত্যি কি কিছু আছে? একটু

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন গৌরনাথ। বছর পঁচিশেক আগে একটি মেয়েকে গান শেখাতে গিয়ে মেয়েটির মাথায় এক কাপ গরম চা ঢেলে দিয়েছিলেন। হঠাৎ সেই মেয়েটির সেই হতভম্ব মুখশ্রী তাঁর মনে পড়লো।

এই ঔদাসীন্য কিন্তু বেশীক্ষণ রক্ষা করা গেলো না। কানে একটা গানের গুন্‌গুনানি শুনতে পেলেন, বারান্দায় দাঁড়ানো ছেলেটি মৃদুস্বরে একটা গানের কলি ভাঁজছে,

'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো॥'

আতঙ্কিত গৌরনাথ কান খাড়া করে রইলেন, কি সর্বনাশ। একটু লক্ষ্য করতেই বুঝলেন ছেলেটির গলা পাকা, সুরটুর ঠিকই আছে। একটা লাইনই বারবার গাইছে, সুর ঠিকই আছে কিন্তু কি একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। ইজি চেয়ারে উঠে বসলেন গৌরনাথ। এই ছাখো 'অ মার' শব্দটা বাদ দিয়ে দিলে। 'আমার পরাণ যাহা চায়' না গেয়ে শুধু 'পরাণ যাহা চায়' 'পরাণ যাহা চায়' বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা লাইন —'পরাণ যাহা চায়' 'পরাণ যাহা চায়' ক্রমাগত ক্রমাগত, অসহ্য হয়ে উঠে সামনের দরজা বন্ধ করে ভিতরের ঘরে গিয়ে বসলেন গৌরনাথ। একটু পরে একটা এ্যাসপিরিণ খেয়ে শুয়ে পড়লেন, মাথায় একটা বালিশ চাপা দিয়ে।

বিকেলের দিকে তাঁর নতুন প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। এখন ভালই লাগলো এদের, মেয়েটি ভারী ভালো, ছেলেটিও ভালো। বেশ সরল, বেশ নিষ্পাপ মুখ ছেলেটির দেখলে মনেই হয় না সকাল বেলা অতো বড় অন্যায় করছিলো একটা শব্দ বাদ দিয়ে। প্রথম শব্দটাই বাদ দিয়ে অমন সুন্দর গানটাকে খুন করে ফেলা—এর পক্ষে সম্ভব। মনেই হয় না। আর সুরটা তো ঠিকই জানে। পুরো গানটা না গেয়ে খালি ঐ ভাঙা লাইনটা। ছেলেটার মুখ কিন্তু ভারী সরল, দু'জনকেই পছন্দ হলো তাঁর। আজ পঁচিশ বছর ধরে নিজের প্রশংসা শুনে শুনে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। তবু আজ এই বিকাল বেলায় এই সুশ্রী দম্পতির মুখে প্রশংসা শুনতে খারাপ লাগলো না।

বেরিয়ে যাওয়ার পথেই কিন্তু আবার সেই বিপর্যয়। ছেলেটির

ঠোঁটে সেই ভাঙা লাইন, সেই গুন্‌গুনানি। কিছু বলবার আগেই ওরা বেরিয়ে গেলো, সিঁড়ি দিয়ে হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে গেলো। ছেলেটি গুন্‌গুন করছে, মেয়েটি নীরব। ছেলেটি কি প্রথম শব্দটা ভুলে গেছে, জানে না?

পরের দিন সকালে সামনের কমন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন গৌরনাথ। জানলার ওপাশ থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলেন সেই কবন্ধ গুনগুনানি। এমন হোলো, রাতদিন আর কিছু ভাবতে পারেন না। সামনের ঘরের দরজাটা খুললেই বা জানালাটা মেলে দিলেই'পরাণ যাহা চায়, পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো।' বার বার ঘুরে ফিরে অস্থির হয়ে গেলেন গৌরনাথ।

সেদিন প্রথম আলাপে ছেলেটির নাম জানা হয় নি। আজ লক্ষ্য করলেন, ওদের দরজায় ওপরে একটা সংক্ষিপ্ত নেমপ্লেট টাঙানো রয়েছে, 'পি, কে, রায়'। ভাবলেন গিয়ে একবার নক করেন, বলে আসেন, এভাবে গানটা না গাইতে। কিন্তু আবার ভাবলেন, সেটা কি খুব অভদ্রতা হবে না, আর ওই বা আমার কথা মানতে যাবে কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন গৌরনাথ, প্রথমে রাস্তায় একটু এদিক-সেদিক হাঁটলেন, তারপর সোজা রামমনোহরের ওখানে। গোলমালটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো, গিয়ে কিন্তু রামমনোহরের দেখা পেলেন না। দেখা হলে মিটমাট হয়ে যেতো নিশ্চয়।

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিকালের দিকে বাসায় ফিরলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, ছেলেটা নামছে। সেই সরল মুখ, সেই সুদর্শন যুবক কিন্তু কি বীভৎস! ঠোঁটে সেই কবন্ধ গুন্‌গুনানি, এর কি কোনো শেষ নেই। ছেলেটি নিজের মনে নেমে যাচ্ছে তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু নামতে দিলেন না গৌরনাথ, একেবারে মাথায় রক্ত চড়ে গেলো, ছেলেটির সার্টের কলারটা চেপে ধরলেন, 'এর মানে কি? এ সব কি?'

ছেলেটি একেবারে হকচকিয়ে গেছে, 'আজ্ঞে, আজ্ঞে কি বলছেন, কি বলতে চাচ্ছেন, কিছু বুঝতে পারছি না।

'বুঝতে পারছেন না? পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো,

আমার কি হোলো? আমার শব্দটা কি উড়ে গেলো? ওটা কি জানেন না, আর কোনো লাইন নেই, আর কোনো গান নেই?' দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে গৌরনাথের।

এইবার যেন ছেলেটি একটু বুঝতে পারে, ব্যাপারটা যেন বোধগম্য হয়েছে তার। একটু হেসে অনুরোধ করে।

'আজ্ঞে জামাটা ছাড়ুন, বলছি। ঐ শব্দটা আমার দরকার নেই।'

জামার কলারটা একটু আলগা করেন গৌরনাথ।

'দরকার নেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নতুন বিয়ে করেছি সেদিন আপনাকে তো বলেছি।'

'হ্যাঁ তাই কি হোলো? লাইসেন্স পেয়েছেন যে কোনো গান যে কোনো ভাবে খুন করবার?' আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন গৌরনাথ।

ছেলেটি কিন্তু চটে না। গৌরনাথকে সে যেন বেশ বুঝতে পেরেছে। বলে--'আজ্ঞে আরো একটা কথা আছে'।

'কি কথা?'

'ঐ শব্দটা, ঐ আমার শব্দটা আমার কোনো দরকার নেই, আমার নিজেরই নাম পরাণ।' গৌরনাথের হাত ছাড়িয়ে 'পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো' গুন্‌গুন করতে করতে ছেলেটি নীচে নেমে যায়। হতবাক গৌরনাথ সিঁড়ির উপরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন।

যাদুকর

১

অধ্যাপক মদনমোহন সরকার এই পাহাড়ী শহরে সস্ত্রীক এসেছেন মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে। এসে উঠেছেন ভজতারণ পাণ্ডের হিল লাইফ হোটেলে।

মদনমোহন ভেবেছিলো গরমের ছুটিতে স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিকায় বেরোবে। কিন্তু যখন সে দেখলো অপর্ণা তাসখেলায় একেবারেই

আনাড়ি, বাধ্য হয়েই তখন সে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ধরে এপ্রিল মাসেই বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলে। তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মধুচন্দ্রিকা যাপনের নিরিবিলি অবসরে অপর্ণাকে তাসখেলা শেখানো।

কিন্তু একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, যার নতুন বিয়ে হয়েছে, যে স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে বেরিয়েছে এবং যে এই বয়স অব্দি তাসখেলাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি, তাকে তাসখেলা শেখানো কি অসম্ভব সেটা মদনমোহন ক্রমশ বুঝতে পারছিলো।

• নববিবাহের প্রথম প্রণয়রসে সিক্তা অপর্ণার এখন স্বামীর সঙ্গে ছলাকলার দিকে ঝোঁক। সে কেন তাসখেলা শিখতে যাবে?

ফলত এই পাহাড়ি শহরের ছোট হোটেলের ঘরটি মান-অভিমান, অনুরাগ-কলহে ভরে উঠেছে। মদনমোহন তার বিয়েয় পাওয়া দু প্যাকেট প্লাস্টিকের তাস ছড়িয়ে বসেছে। সেই ফুলশয্যার রাত থেকে রাতদিন চেষ্টা চলছে; হরতন, ইস্কাবন, চিড়িতন আর রুহিতনের জালে অপর্ণা একেক সময় হাঁফিয়ে উঠছে।

আরেকটা অসুবিধা হয়েছে এই যে, মদনমোহন বিরক্ত বোধ করলেই বলে, 'ধুত্তোরি ছাই।' আর এই কথাটা শুনলেই অপর্ণার ভীষণ হাসি পায়। সেই ছোটবেলায় অপর্ণাদের মফস্বল শহরের বাড়ির উল্টোদিকে একটা নিমগাছের ডালে বসে একটা পাগলা সারা সকাল দাঁতন করতো আর কাছাকাছি লোকজন দেখলেই 'ধুত্তোরি ছাই' করে উঠতো। সেই থেকে অপর্ণার এক রোগ এই কথাটা শুনলে হাসি কিছুতে সামলাতে পারে না।

এদিকে মদনমোহন অধ্যাপকসুলভ কায়দায় তাসশিক্ষার একটা রুটিন করে নিয়েছে। যেমন সকালে তাসের সংখ্যা ও রঙ; দুপুরে বিভিন্ন তাসের বিভিন্ন ব্যবহার, বিকালে তাস খেলা কয় প্রকার ইত্যাদি।

এই মাত্র মদনমোহন সাহেব বড় না বিবি বড়—এইটা বোঝাচ্ছিলো অপর্ণাকে। কিন্তু অপর্ণার তখন নজর পড়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে পূবের একটা ফিকে সবুজ রঙের বাচ্চা পাহাড়ের দিকে। মদনমোহন যখন টেক্কা-সাহেব-বিবির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতায় ব্যস্ত, তখন

আসলে অপর্ণা কিছুই শুনছে না। মদনমোহন যেই জিজ্ঞাসা করলো, 'শুনলে ?' অপর্ণা পাশ কাটিয়ে অনুরোধ করলো, 'চলো না, ঐ ছোট পাহাড়টায় একটু ঘুরে আসি।'

এরকম এই প্রথম নয়, আরো এক হাজার একবার হয়েছে। হতাশ, ক্লান্ত মদনমোহন রাগে, দুঃখে প্লাস্টিকের তাসগুলি যা এতক্ষণ বিছানার উপরে ছড়ানো ছিলো, তুলে নিয়ে সোজা খোলা জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিলো।

পাঁড়েজি অর্থাৎ হিল লাইফ হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পাণ্ডে এই সময় বাজার করে ফিরছিলেন। তাঁরই চোখের সামনে পাখির পালকের মতো তাসগুলি ছড়িয়ে ছাইগাদার উপরে এসে পড়লো।

একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অপর্ণা। ভীষণ গম্ভীর ও থমথমে মুখ তার। কিন্তু পাঁড়েজির নজরে সেটা পড়লো না। তিনি দেখলেন, মেয়েটি ধীর স্থির পায়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঐ নোংরা ছাইগাদা থেকে সবক'টি তাস কুড়িয়ে নিলো। তিনি স্পষ্টই লক্ষ্য করলেন যে, মেয়েটির চালচলনে একটি যাদুকরী মহিমা আছে। তিনি আরো অভিভূত হয়ে পড়লেন যখন দেখলেন যে, অপর্ণা তাসগুলি টিউবওয়েলে ধুতে নিয়ে গেলো।

এর আগে পাঁড়েজি প্লাস্টিকের তাস দেখেননি। তাঁর অতিবড় কল্পনাতেও এমন কিছু নেই যেখানে তাসের প্যাকেট জল দিয়ে ধোয়ামোছা করা যায়।

সুটকেশে প্রফেসার এবং সরকার দেখে মদন-দম্পতি সম্পর্কে ম্যাজিসিয়ান বলে প্রথমে তাঁর মনে যে ধারণা হয়েছিলো, জানলা দিয়ে তাস উড়ে পড়া এবং তারপরে এই জল দিয়ে তাস ধোয়া দেখে এবার সেটা বদ্ধমূল হলো।

তার উপরে এই কিছুদিন হলো একটু দূরের জংশন শহরে একজন যাদুকর খেলা দেখাচ্ছেন। পাঁড়েজির হোটেলের একজন খদ্দের বলেছিলো, তিনি নাকি এই শহরেও আসছেন। পাঁড়েজির তখন সেটা বিশ্বাস হয়নি। আজ পঁচিশ বছর তিনি এইখানে হোটেলে ম্যানেজারি

করছেন। এই জংলি শহরে যাত্রা এসেছে, সার্কাস এসেছে, থিয়েটার, পুতুলনাচ পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু ম্যাজিক কখনো আসেনি। পাঁড়েজি ম্যাজিকের সত্যিমিথ্যে হাজার গল্প আশৈশব শুনে এসেছেন, কিন্তু কখনোই ভালো ম্যাজিক দেখেননি।

মদন-দম্পতির হাবভাব, চালচলন দেখে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্বপ্ন এতদিনে সফল হতে চলেছে। এঁরাই ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন। কিন্তু এই বোকা শহরের লোকগুলোর যা ছিরিছন্দ, ম্যাজিসিয়ান শেষপর্যন্ত ম্যাজিক দেখাবে কি? এই প্রশ্নের খোঁচায় পাঁড়েজি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু উত্তর পাওয়া কি এতই সোজা!

২

'হিল লাইফ' হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পাণ্ডে ত্রিকালদর্শী পুরুষ। তাঁর অনুমানে কখনও ভুল হয় না।

'হিল লাইফ' নাম শুনেই যাঁরা ভজতারণ বাবুকে এবং কোন শহরে কোন্ হোটেলের কথা এখানে বলা হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তাঁদের প্রথমেই বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, বাংলা বিহারের সীমানায় যে পাহড়ী এলাকায় আধাশহরগুলোর খুব স্বাস্থ্যকর বলে নাম আছে, তাদের প্রত্যেকটিতে একটি করে 'হিল লাইফ' নামে হোটেল আছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই ম্যানেজারের নাম ভজতারণ পাণ্ডে।

এই এলাকার আধাশহরগুলোর স্বাস্থ্যকর খ্যাতি কবে, কি করে রটেছিল কিংবা কে বা কারা কি স্বার্থবশে এই মিথ্যা রটনা করেছিলো তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। গ্রীষ্মকালে যেমন ভয়ঙ্কর গরম পড়ে, বর্ষাকালে তেমনই বৃষ্টি, কাদা, মশা, সাপ। আর শীতে দারুণ ঠাণ্ডা, কেউ কখনো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু রাত্রিতে গোপনে বরফ পড়ে এ বিষয়ে যাঁরাই শীতে এই অঞ্চলে কখনো না কখনো বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

এইরকম একটি স্বাস্থ্যকর শহরে 'হিল লাইফ' নামীয় হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পাণ্ডে, যাঁকে অনেকেই পাঁড়েজি বলে সম্বোধন করে, তিনি একদিন সকালে বাজার করে হোটেলে ঢোকার পথে

দেখলেন যে তাঁরই হোটেলের দোতলার ঘরের জানলা থেকে এক গুচ্ছ তাস হাওয়ায় উড়ে এসে হোটেলের রান্নাঘরের সামনে ছাইগাদায় ছড়িয়ে পড়লো।

হোটেলের ঐ ঘরটিতে একজোড়া যুবক-যুবতি, দেখে মনে হয় নবদম্পতি আজ কয়দিন হলো এসে উঠেছে। কি করে যেন কি কি লক্ষণ দেখে পাঁড়েজির ধারণা হয়েছে যে, এঁরা হয়তো কোন ম্যাজিসিয়ান দম্পতি। প্রথমেই পাঁড়েজিব সন্দেহ হয়েছিলো এদের কালো সুটকেশটি দেখে। কালো চামড়ার সুটকেশের ওপর গোটা গোটা হরফে ইংরাজীতে লেখা প্রোফ (Prof.) এম এম সরকার এবং তারপরে বাংলায় লেখা প্রফেসার মদনমোহন সরকার।

প্রথমত প্রফেসার, তার উপরে সরকার। পাঁড়েজির বিপুল অভিজ্ঞতায় এমন কোনো যাদুকর কোথাও দেখেন নি যে প্রফেসার নয় এবং সরকার নয়। তাব উপরে এইমাত্র যে দোতলার জানলা দিয়ে তাসবৃষ্টি হচ্ছিলো সেও নিশ্চয়ই কোনো যাদুর খেলারই অংশ।

পাঁড়েজি এইসব ভাবছেন এমন সময় দোতালার ঘর থেকে যুবতিটি গম্ভীর মুখে বেড়িয়ে এলো। বাজারের থলে হাতে পাঁড়েজি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এরপরে যা ঘটলো সেটা বলার আগে সামান্য কিছুদিন আগের কথা একটু বলে নেয়া ভালো।

সামান্য কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত মদনমোহন সরকারের বিয়ে হয়েছে। একটু আগে দোতলার ঘর থেকে যে মেয়েটি বেরুল তার নাম অপর্ণা। অপর্ণা মদনমোহনের সদ্য-পরিণীতাপত্নী। মদনমোহনের বয়স নিতান্ত আটাশ। তার পেশা অধ্যাপনা, কলকাতার শহরতলীর একটি কলেজের বিজ্ঞানবিভাগে সে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। যে কালো সুটকেসটির উপরে প্রফেসর এম এম সরকার লেখা, সেটি সে অন্যান্য দ্রব্য ও অপর্ণাসহ সদ্যবিবাহ করে অর্জন করেছে। শ্বশুরালয় জামাতার নামের পূর্বে পদমর্যাদা যোগ করে দেওয়ায় মদনমোহন কতটা খুশি হয়েছে বলা কঠিন। তবে মদনমোহন সম্পর্কে একটি কথা এখানে

বলে রাখা ভালো। মদনমোহন পৃথিবীর সমস্ত লোককে দুই ভাগে ভাগ করে দেখে। এক, যারা তাস খেলে আর দুই যারা তাস খেলে না। অর্থাৎ মদনমোহন অতীব তাসাসক্ত। তার বন্ধুরা তার বিয়েতে দুই প্যাকেট প্লাস্টিকের তাস উপহার দিয়েছে।

দুঃখের বিষয়, বিয়ের আগে অপর্ণা তাসের ত অক্ষরও জানতো না। শিক্ষা শুরু হলো ফুলশয্যার রাত্রিতেই। ফুলশয্যার রাতে বনস্পতির প্রথম বাক্যালাপ এই রকম হয়েছিল :

মদনমোহন (অপর্ণার হাত ধরে)—'বসো'।

অপর্ণা (নিচু গলায়)—'এই বসেছি।'

মদনমোহন—'তুমি তাস খেলতে জানো ?'

অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'না।'

মদনমোহন (একটু হতাশ কণ্ঠে)—'তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো।'

অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'আচ্ছা।'

এরপর একটু চুপচাপ। মদনমোহন একটু কেশে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার আমাকে ভালো লাগছে ?'

অপর্ণা সলজ্জ হেসে বললো, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। আবার মদনমোহন প্রশ্ন, 'এক প্যাকেটে কটা তাস থাকে জানো ?'

অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'না।'

মদনমোহন বললো, 'বাহান্নটা।'

অপর্ণা চুপ। মদনমোহন বললো, 'মনে থাকবে তো, বাহান্নটা।'

তারপর বললো, 'বাপের বাড়ি ছেড়ে এসে তোমার মন কেমন করছে, না ?' অপর্ণা ধরাগলায় কি বললো ঠিক বোঝা গেলো না।

একটু পরে আবার মদনমোহনের গলা শোনা গেলো, 'বল তো এক প্যাকেটে কটা তাস থাকে ?'

অতঃপর মদনমোহন এবং অপর্ণার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। এমনিতেই তো তাসখেলা শিখতে গিয়ে বিপুল নাজেহাল হয়ে পড়েছে

অপর্ণা। তার উপরে এই যাদুকরী সন্দেহ। মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে এসে এমন বিপদে বোধহয় আর কোনো নবদম্পতি কখনো পড়েনি।

পাঁড়েজি এবং তার হোটেলের বোর্ডারদের মধ্যে প্রথমে ফিসফাস করে আলোচনা শুরু হলো এই যাদুকর দম্পতি নিয়ে। তাঁরা মদন ও অপর্ণার সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যেই ম্যাজিকের ছোঁয়া দেখতে পেলেন। তাঁদের আলোচনা অতি দ্রুত হিল লাইফ হোটেলের সীমানা ছাড়িয়ে এই ছোট শহরের বাজারে, রাস্তায়, অফিসে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্রমাগত কৌতুহলী জনতার ভিড়ে হিল লাইফ হোটেল ছেয়ে রইলো। মদন-দম্পতির রাস্তায় বেরিয়েও রেহাই নেই। সর্বদাই পশ্চাতে, প্রায় পনেরো ফুটের নিরাপদ ব্যবধানে, অন্ততঃ সাত-আটজন লোক। সব সময়েই চাপা গলায় তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে সবাই কি সব আলোচনা করছে।

মদনমোহন অথবা অপর্ণা কেউই প্রথমে ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি ঘটনাটা কি? প্রথমে হোটেলে ভিড় দেখে তারা দুজনেই ভেবেছিলো যে হোটেলে বোধহয় কোনো রাজনৈতিক নেতা বা চিত্রতারকা বা ঐ জাতীয় অতি জনপ্রিয় কেউ আশ্রয় নিয়েছেন।

কিন্তু যখন জনতা মদনমোহনের পিছে পিছেই ঘুরতে লাগলো, তার ভয় হলো যে এরা কি তাকে অন্য কিছু ভেবে ভুল করছে। চিত্রতারকা? কিন্তু শহরতলীর কলেজের পদার্থবিদ্যার নিরীহ অধ্যাপক সে, তার চেহারার মধ্যে কোথাও চিত্রতারকার কোনো ব্যাপার নেই। তবে, সব নবীন স্বামীর মতই তার মনে হলো যে তার স্ত্রী অপর্ণা একেবারে যাকে বলে চিত্রতারকার মত দেখতে। সবাই হয়তো তাই ভুল করেছে। কিন্তু মদনমোহন অপর্ণাকে ঘরে রেখে নিজে একা রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো তথাপি এক দঙ্গল ভিড় তাকে অনুসরণ করছে।

এইবার তার রীতিমত ভয় হলো। এরা তাকে কোনো ফৌজদারি মামলার পলাতক আসামী বলে ধরে নেয়নি তো। রাস্তায় পাশের পানের দোকানে এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য একটা দশ টাকার নোট দিতে সেই দোকানী এত বেশী উল্টেপাল্টে নোটটা দেখতে লাগলো

যে মদনমোহন রীতিমত সন্দেহ হলো যে এরা বোধহয় তাকে কোনো কুখ্যাত জালিয়াত বলে ভুল করেছে। দোকানী অনেকক্ষণ দেখেশুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নোটটা ভাঙিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আর খুচরো ফেরত দিলো। আর যেই সে দোকান ছেড়ে বেরিয়েছে অমনি সেই এক দঙ্গল লোক দোকানের উপর হুমড়িয়ে পড়ে তার দেয়া নোটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

হোটেলে ফিরেও স্বস্তি নেই। হোটেলের সমস্ত বোর্ডার, ঠাকুর-চাকর এবং সবচেয়ে বেশি করে ম্যানেজার পাঁড়েজি তাকে দেখে কিরকম অর্থময় হাসি হাসে।

তাস খেলা শেখানো মাথায় উঠেছে। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচে। রাস্তায় বেরোলে পিছনে পিছনে ভিড়, চারদিকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ। হোটেলের ভিতরেও তাই। ময়দানে মিটিং করে করে ফুলশয্যা যাপন করার মতই অসম্ভব এই রকম অবস্থায় ম চন্দ্রিকা উপভোগ করা। তার উপরে দুশ্চিন্তা, এরা কি ভাবছে, এরা কেন অনুসরণ করছে? কি এদের এত কৌতূহলের কারণ?

ঘরের দরজাও খুলে রাখার উপায় নেই। কেউ না কেউ ছাদে যাওয়ার ছলে একবার উঁকি দিয়ে দেখে যাবে তারা কি করছে। ভালো আপদ হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে অন্ধকারে উদ্বিগ্ন মুখে নবদম্পতি মুখোমুখি বসে—কি করা যায়? দুজনে মিলে ঠিক হলো আগামীকাল সন্ধ্যাতেই ফিরে যাবে। আর নয়। তবে গরমের ছুটিতে আরেকবার মধুচন্দ্রিকায় বেরোতে হবে, এবার একেবারেই জমলো না। সেই সময়েই অপর্ণা একেবারে পুরোপুরি শিখে নেবে তাস খেলাটা।

দুজনে মিলে এই রকম আলোচনা করতে করতে মনের মধ্যের উদ্বিগ্ন ভাবটা একটু কমে এসেছে। জানলা দিয়ে দূরের দিকে সবুজ রঙের বাচ্চা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে অপর্ণা দেখলো সেটা এই সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে কেমন ফিকে নীলচে হয়ে এসেছে। অপর্ণা মদনমোহনের হাত ধরে টান দিয়ে বললো, 'চলো ঐ পাহাড়টায় একটু

যাই। এখন এই অন্ধকারের কে আমাদের দেখবে বা পিছু নেবে?' মদনমোহনের একটু সংশয় ছিলো যদিও, কিন্তু কোনো আপত্তি ছিলো না। ঘরের মধ্যে আরো দম আটকে আসছিলো।

দুজনে মিলে উঠে বেরোতে যাচ্ছে। এমন সময় তারা দরজা খুলবার আগেই বন্ধ দরজার কড়াটা কে যেন একটু খুট্‌খুট্‌ করে নাড়লো। মদনমোহন দরজা খুলে দিতেই দেখে পাঁড়েজি। পাঁড়েজি একই রকম অর্থময় হাসি হেসে বললেন, 'প্রফেসার সরকার, আপনাদের সঙ্গে এখানকার দারোগাবাবু একটু আলাপ করতে এসেছেন।'

দারোগাবাবুর আলাপ করতে আসা শুনে মদনমোহন বুঝতে পারলো এবার তাকে বিনাদোষে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হচ্ছে। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

দারোগার নাম শুনে মদনমোহনের প্রাণে যতটা ভয় হয়েছিল দারোগাকে দেখে কিন্তু ভয় একটু কাটলো। এই গরমেও গলায় সিল্কের মাফলার জড়ানো, প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত লম্বা জুলপি, চিকন প্রজাপতি সিরিজের গোঁফ, তার কয়েকটা লোম সদ্য পেকেছে, চোখে-মুখে আমুদে চেহারা এই লোকটিকে দারোগার পোষাকে যেন বড় বেমানান মনে হচ্ছে।

মদনমোহনের ভরসা হলো যে সে চেষ্টা করলেই এই দারোগাবাবুকে বোঝাতে পারবে যে সে আসলে নিরীহ অধ্যাপক। কোনো ফৌজদারী মামলার পলাতক আসামী বা জালিয়াত অথবা ঐ জাতীয় কিছু নয়।

কিন্তু দারোগার কথা শুনে তার মন আবার সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। দারোগা মদনমোহনকে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্য অভিনন্দন জানিয়ে বললো, 'আসুন, আসুন। আপনার কথা এতই শুনছি যে আপনাকে না দেখে থাকতে পারলাম না। একেবারে থানার কাজ ফেলে রেখে চলে এলাম।'

এরই সঙ্গে পাঁড়েজি যোগ দিলেন, 'আপনার সব কথাই আমি ওঁকে বলেছি।'

কি বলেছে পাঁড়েজি, কে জানে? মদনমোহন ভয়ঙ্কর ঘামতে

লাগলো।

দারোগাবাবু আবার বলতে লাগলেন, 'আপনার মত গুণী লোক আমাদের এই অজ শহরে যে পদধুলি দেবেন এ আমরা আশা করতে পারি না।'

কথাগুলো কেমন ব্যাঙ্গের মত শোনাতে লাগলো মদনমোহনের কানে। এরকম স্তুতি বাক্য শোনা তার বিশেষ অভ্যাস নেই। সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো; হাতজোড় করে বললো, 'পাঁড়েজি বা দারোগাবাবু, আপনারা কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সকাল-সন্ধ্যা আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ঘিরে এত ভিড় কিসের?'

দারোগাবাবু কিছু বলার আগেই হাত কচলাতে কচলাতে পাঁড়েজি উত্তর দিলেন, 'আপনার মত এতবড় ম্যাজিসিয়ান আমাদের এখানে এসেছেন। তা লোকজনের একটু উৎসাহ হবে না? তারা আপনাকে দেখতে চাইলে আপনি কি না করতে পারেন?'

মদনমোহন বিস্মৃত, বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, ম্যাজিসিয়ান, তার মানে?'

দারোগাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে আপনি। দারোগা-গিরি করছি আমি বারো বছর। আমার কাছে আর গোপন করবেন না প্রফেসর সরকার।'

বহু চেষ্টা করলো মদনমোহন, সেই চেষ্টায় সতী-সাধ্বী অপর্ণাও যোগ দিলো, কিন্তু এদের মন থেকে কিছুতেই, সে বা তারা যে মোটেই ম্যাজিসিয়ান নয়, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারলো না।

এই রকম বিপদে মানুষে পড়ে! এর চেয়ে জালিয়াত হয়ে জেলে গেলে কখনো না কখনো খালাস পাওয়া যেতো। কিন্তু এদের হাত থেকে খালাস নেই। শহরের সমস্ত লোক দাবি জানিয়েছে যে প্রফেসর সরকারকে এই শহরে অন্ততঃ একবারের জন্যও ম্যাজিক দেখাতে হবে।

কোন উপায় নেই। ঠিক হলো যা কিছু যোগাড়যন্ত্র শহরের লোকেরাই করবে। পরের দিন বিকালে স্টেশনের সামনের মাঠে ম্যাজিক দেখাতে হবে।

সেই রাতে মদনমোহন ও অপর্ণা কারোর চোখের পাতাতেই একবিন্দু ঘুম নেই। ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা সামান্য জিনিস নয়। তারা এসবের কখগ পর্যন্ত জানে না। কি ম্যাজিক দেখাবে?

সবচেয়ে ভালো ম্যাজিক হতে পারে পালিয়ে যাওয়া। একেবারে এখান থেকে নিরুদ্দেশ, গায়েব হয়ে যাওয়া। কিন্তু পাঁড়েজির চোখ ফাঁকি দিয়ে হোটেল থেকে বেরুনো অসম্ভব। তাছাড়া এই আধাচেনা দেহাতি শহরে রাতের বেলা বৌ নিয়ে বেরুনোও বোধহয় খুব নিরাপদ নয়। আর দিনের বেলা সারাক্ষণ পিছনে ফেউয়ের দল লেগে। কি করে পালানো যাবে তাদের চোখের সম্মুখ থেকে।

সুতরাং সমস্যার শেষ নেই। ম্যাজিক যদি না দেখাতে পারে তাহলে কি হবে, দু'জন মিলে তাই ভাবতে লাগলো।

এদিকে ভোর হয়ে এলো। ভোরের বেলা মদনমোহনের মন একটু একটু করে সাফ হয়ে এলো। ছাত্রজীবনেও সে দেখেছে পরীক্ষার আগে সে যত রাত জেগেছে তত তার মাথা সাফ হয়েছে সে অপর্ণার সঙ্গে এবার ম্যাজিক নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো, দুজনে কে কত রকম ম্যাজিক দেখেছে তাই দিয়ে একটা ফিরিস্তি বানালো :—

(১) ঘড়ি গুঁড়ো করে আবার ভাল করা।

(২) একশো টাকার নোট পুড়িয়ে ফেলে আবার ঠিক করা।

(৩) হাতে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে চাবি কুয়োর জলে ফেলে দিয়ে হ্যাণ্ডকাফ অনায়াসে খুলে ফেলা।

(৪) বাক্সের ভিতরে আটকিয়ে রেখে বের করে আনা।

(৫) পাখি উড়িয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনা।

(৬) চলন্ত ট্রেণ ষ্টেজের উপর নিয়ে আসা।

পরের দিন বিকাল বেলা। ষ্টেশনের সামনের মাঠ লোকে লোকারণ্য। সকালেই মদনমোহন ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছে তার কি কি জিনিস প্রয়োজন। সব ঠিকমতো এসে গেছে।

সাড়ে পাঁচটায় ম্যাজিক আরম্ভ হবার কথা। মদনমোহন তার

প্রফেসর এম এম সরকার লেখা সুটকেশ এবং অপর্ণাসহ পাঁচটা নাগাদ মাঠে এসে পৌঁছলো। আগেই খোঁজ নিয়েছে মাঠের পাশে যে রেল লাইন সেখান দিয়ে কলকাতার একটা ট্রেন যায় সাড়ে ছয়টায়, তবে এ ষ্টেশনে দাঁড়ায় না। দাঁড়ায় গিয়ে পরের জংশন ষ্টেশনে।

ম্যাজিকের মাঠে গিয়ে প্রথমেই মদনমোহন খোঁজ করলো স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার এসেছেন কি না। তাঁকে খুঁজে বের করে একেবারে মঞ্চে এনে বসালো। তারপর মিলিয়ে নিলো ফিরিস্তি অনুযায়ী জিনিস এসেছে কিনা। সবই ঠিক এসেছে। এক জোড়া হামানদিস্তা, দারোগাবাবুর থানা থেকে তুটো হ্যাণ্ডকাপ, বাজারে জুতোর দোকান থেকে বড় কালো ষ্টিলের বাক্স। একটা খাঁচাশুদ্ধ পাখি আনার কথা ছিলো, সেটাও আনা হয়েছে। একটা সুন্দর তোতা পাখি। বেশ কথা বলে। কিন্তু অতি বজ্জাত, মদনমোহনকে দেখেই, 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে লাগলো।

পাখিটার উপর বিষম রাগ হলো মদনমোহনের। প্রথমেই বিদায় করতে হবে এটাকে।

সাড়ে পাঁচটায়, একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে মদনমোহন আর অপর্ণা উঠে গেলো মঞ্চের উপরে। প্রথমেই পাখির গলা। খাঁচা-শুদ্ধ পাখিটাকে হাতে নিয়ে মদনমোহন জিজ্ঞাসা করলো, 'এই তোতা পাখিটা কার?' এখানকার বি. ডি. ও. সাহেবের স্ত্রী গর্বিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন, 'এ পাখিটা আমার।'

এ পাখিটা আপনার ভালো লাগে?' জাত যাতুকরের মত মদন-মোহন প্রশ্ন করলো।

বি. ডি. ও. সাহেবের স্ত্রী ডগমগ হয়ে জানালেন 'হ্যাঁ'।

'ঠিক আছে। এই রকম আরো একটা পাখি আপনাকে আনিয়ে দিচ্ছি আমি।' বলে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলো মদনমোহন। এতক্ষণ পাখিটা তারস্বরে 'চোর চোর' বলে চেঁচাচ্ছিলো, এইবার 'সাধু, সাধু' বলে উড়ে গেলো। উড্ডীয়মান তোতা পাখিটার দিকে মদন ও অপর্ণা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো যতক্ষণ না সেটা দিগন্তে বিলীন হয়ে

গেলো।

এইবার দ্বিতীয় খেলা। মঞ্চের সামনে অপর্ণা এগিয়ে গেলো। তারপর মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'আপনাদের কারোর হাতে সোনার ঘড়ি আছে?'

সুন্দরী কণ্ঠের এই প্রশ্নে একসঙ্গে দশ-বারোটা মণিবন্ধ এগিয়ে এলো। একবার মদনমোহনের দিকে তাকিয়ে সব কটাই খুলে নিলো অপর্ণা। তারপর হামানদিস্তার মধ্যে ফেলে ষ্টেশন মাষ্টার মশাইকে বললো, 'আপনি এগুলো গুঁড়ো করে ফেলুন একেবারে।'

এরপরে আবার একবার অপর্ণার মধুর অনুরোধ শোনা গেলো, আপনাদের কারো কাছে একশো টাকার নোট থাকলে দিয়ে দিন। বেশি নয় মাত্র তেইশটা একশো টাকার নোট পাওয়া গেল। নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্যে, দর্শকদের মধ্য থেকে কাকে যেন অপর্ণা ডাকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু মদনমোহনের মনের মধ্যে তখন অমানুষিক উত্তেজনা। সে নিজেই সবকটা নোট গোছা করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে ফেললো। হতবাক, বিস্মিত জনসমুদ্র ম্যাজিসিয়ান দম্পতির খেলা দেখতে লাগলো।

এইবার হ্যাণ্ডকাপ দুটো হাতে তুলে নিলো মদনমোহন। তারপর দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, এই একটা মাত্র চাবি; এ ছাড়া আর কোনো চাবি দিয়ে খোলা যাবে না তো?'

দারোগাবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, না।'

'আপনি ছাড়া আপনার থানার আর কে আছে এখানে?' মদনমোহন জিজ্ঞাসা করতে দেখা গেলো অনেকেই, বোধহয় থানার সবাই এখানে। মদনমোহন হাবিলদারকে আর সেই দারোগাবাবুকে মঞ্চে ডেকে এনে দুজনের হাতে আচ্ছা করে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

এবার পাঁড়েজির পালা। পাঁড়েজিকে ডাকতে তিনি মঞ্চে উঠে এলেন। বিরাট স্টিলের বাক্সের ডালা তুলে তার মধ্যে পাঁড়েজিকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারপর মদন নিজের হাতে একটা শক্ত ছয় লিভারের তালা সেই বাক্সের গায়ে লাগিয়ে দিলো।

এবার একজন দর্শককে ডেকে বললো, 'সামনের ঐ ইঁদারার মধ্যে এই হাতকড়ার আর বাক্সের চাবি ফেলে দিন।'

আর একটা কাজ বাকি। ষ্টেশন মাষ্টারকে বললো, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর ঘড়ি গুঁড়ো করতে হবে না। এখন এই সাড়ে ছটায় যে ট্রেনটা আসছে, সেটা এখানে এই সভার পাশে সিগন্যাল দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিন। আমরা উঠে গিয়ে সেটাকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসি।' ষ্টেশন মাষ্টার আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সমবেত জনতার দাবীতে তাঁকে সিগন্যাল ঠেকাতেই হলো। গাড়ি ঘ্যাচাং করে থেমে যাওয়া মাত্র প্রফেসার মদনমোহন সরকার একহাতে স্যুটকেস অন্য হাতে স্ত্রীকে ধরে সোজা গাড়ির ড্রাইভারের কামরায় উঠে বললেন, 'গাড়িটা ছেড়ে দিন। না হলে এই গাড়িটা ঐ মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। লাইন ছাড়া গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন? না হলে সবাই মারা পড়বো। তাড়াতাড়ি ছাড়ুন।'

গাড়ি ছেড়ে দিলো। কিন্তু মঞ্চের উপর উঠে এলো না; যখন বুঝতে পারলো যাদু-পিপাসু জনতা তখন মদন-অপর্ণা জংশন ষ্টেশনের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে।

মুনশাইন টকি কাম থিয়েটার হল

বাংলা তেরশ চল্লিশ সালের বৈশাখ মাসে শেষের দিকে একদিন যদি সন্ধ্যাবেলা সেই সাংঘাতিক ঝড় না হতো, তাহলে ঢাকার থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আমাদের সেই মফস্বলের ছোট শহরে কিছু কিছু ক্ষতি নিশ্চয়ই কম হতো কিন্তু মুনশাইন সিনেমা কোনোদিনই স্থাপিত হতো কিনা সন্দেহ।

শেষ বৈশাখের কালবৈশাখীতে মহামায়া হাইস্কুলের সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছ পড়ে গেলো, কতকালের পুরানো গাছ, কেউ মনে করতে পারতো না সে-গাছ সে দেখেনি কিনা, এছাড়া তিন-আনি বাজারের অর্ধেকটাই উড়ে গেলো আর উড়ে গেলো কেদার পোদ্দারের পাটের গুদাম। পাটের গুদাম উড়ে গিয়ে পড়ল বাজারের পিছনে, যেখানে বুড়াই নদীর চড়ায়

খেয়াঘাটের অফিস, তারই পাশে আর ঠিক সেখানেই সেই একই ঝড়ে একেবারে বালির চড়ার উপরে উঠে গেলো কানা ম্যাকিন্‌তোষসাহেবের পুরানো স্টিমলঞ্চ। সবই তাজ্জব ব্যাপার।

বেশ কিছুদিন পাশাপাশি পড়ে রইলো দুটোই। কেদার পোদ্দার বা ম্যাকিন্‌তোষসাহেব কেউই সরিয়ে নিলো না তাদের সম্পত্তি। এর মধ্যে শীত এসে গেলো, টিনের বেড়ায় মরচে ধরতে লাগলো মোটর লঞ্চের কাঠের টুকরো দু-একটা করে খুলে পড়তে লাগলো।

শীতের মরসুমে বারোয়ারি থিয়েটারের পালা। দি ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাব আর জোয়ারদারপাড়া যুবক সমিতির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। জোয়ারদারপাড়া যুবক সমিতি একশো এক টাকা চাঁদা দিয়ে স্থানীয় কালীবাড়ীর নাটমন্দির পুরো শীতকালের জন্য দখল করে নিলো, ব্যাপারটা ন্যাশনাল ড্রামটিক ক্লাবের অগোচরেই ঘটলে, যখন ন্যাশনাল জানতে পারলো, তখন সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে শহরের একমাত্র নাট্যমঞ্চটি জোয়ারদারপাড়ার দখলে।

ন্যাশনালের চেয়ারম্যান গোপাল মোক্তার ছিলেন যাকে বলে ধুরন্ধর ব্যক্তি। তিনি প্রথমে কালীবাড়ির হরিসভা সমিতির বুড়োদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যখন বুঝতে পারলেন আর কিছুতেই এ-শীতে নাটমন্দির পাওয়া সম্ভব নয়, আর জোয়ারদারপাড়াও চিরশত্রু ন্যাশনালকে কায়দা করার এই সুবর্ণসুযোগ কোনো আপোসরফার মধ্যে গিয়ে হারাতে চাইবে না তখন গোপাল মোক্তারের নজর পড়লো ঐ কেদার পোদ্দারের উড়ে-যাওয়া পাট-গুদামের ওপর। সাতদিনের মধ্যে বিনা চাঁদায় বৃদ্ধ কেদার পোদ্দারকে ন্যাশনাল লাইফ-চেয়ারম্যান করে ফেললো। তারপর প্রায় জোর করে ঐ পাট-গুদাম লিখিয়ে নিলো ন্যাশনালের নামে। কথা হলো, কেদার পোদ্দারের মৃত্যু হলে ঐ গুদাম দিয়ে যে থিয়েটার-হল হবে, তার নাম হবে কেদার মেমোরিয়াল হল।

কেদার পোদ্দার বিষয়ী লোক, অত সহজে রাজি হওয়ার ব্যাপার নয়। যদিও যুদ্ধের আগের বাজার আর তার উপরে উড়ে-যাওয়া টিন কিন্তু তিনি বললেন, 'এতে আমার কি লাভ হবে?'

'আপনার লাভ আর কি? আপনার নাম হবে, সব লোকেই আপনার নাম করবে।' গোপাল মোক্তার বোঝালেন।

কেদার পোদ্দার একটু হেসে বললেন, 'তাতে আমার লাভ কি হলো?'

এই প্রশ্নের পরে লাভ কি হবে বোঝানো খুবই কঠিন। তবু গোপাল মোক্তার বোঝাতে কসুর করলেন না। অনেক শুনে নিয়ে কেদার পোদ্দার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'ঐ কানা-সাহেবের লঞ্চে মেশিন-টেশিন কিছু আছে?'

গোপাল মোক্তার তাঁর মোক্তারি বুদ্ধিতেও কিছু ধরতে পারলেন না ভাঙা-লঞ্চের মেশিনের সঙ্গে থিয়েটারের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

বহুক্ষণ পরে কেদার পোদ্দারের বক্তব্য বোঝা গেলো, ম্যাকিনতোষের লঞ্চের মেশিনটা আর পাটগুদামটা একত্র করে একটা টকি-হল করা যায় কিনা যেমন ওপারে ঐ মানিকগঞ্জে হয়েছে। টকি-হল করলে খুব পয়সা হচ্ছে আজকাল। থিয়েটার করে কি হবে।

কিন্তু লঞ্চের মেশিন দিয়ে টকি-হল, সেটা কি করে সম্ভব? গোপাল মোক্তার বা ন্যাশনালের কেউই কিছু বুঝতে পারলো না। শুধু সব শুনে শহরের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনীয়ার ক্ষ্যাপা মহেশ যে কোচম্যান থেকে স্বীয় প্রতিভাবলে মোটর-ড্রাইভার হয়েছিলো সে বললো, 'তা হতে পারে, তবে একবার মানিকগঞ্জ গিয়ে টকি-কলটা দেখে আসতে হবে। রাহাখরচা দিয়ে দিন, চলে যাচ্ছি।'

ক্ষ্যাপা মহেশের রাহাখরচা মানে শুধু স্টীমার ভাড়া নয়, আরো একাধিক আনুষঙ্গিক আছে, সেগুলি জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞাসা না করেও সবাই জানে, কি কি আর সেই সঙ্গে আছে মহেশের সাকরেদ—বিলাস, মহেশ যাকে বলে এ্যাসিটেন অর্থাৎ এ্যাসিস্ট্যান্ট।

সুতরাং এত খরচখরচার আগে একবার খবর নেয়া দরকার ম্যাকিনতোষ পোড়ো লঞ্চটা ছেড়ে দেবে কিনা।

গোপাল মোক্তার এবং সম্প্রদায় প্রথমে ম্যাকিনতোষের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। ম্যাকিনতোষসাহেব যে এত সহজে রাজি

হয়ে যাবে এটা কারোর কল্পনাতেই কিন্তু ছিলো না। কানা সাহেব অকেজো চোখের সাদা তারাটা যথাসম্ভব না কাঁপিয়ে বললো 'অল্ রাইট, আমি রাজি আছে, কিন্তু আমার নামে হোলটার নাম দিতে হোবে।'

গোপাল মোক্তার ইতিমধ্যে কেদার পোদ্দারকে প্রস্তাব করে এসেছেন হলটা তাঁর নামেই করবেন, এখন ম্যাকিনতোষ নিজের নামে চাইছে, একটু গোলমাল হয়ে গেলো ব্যাপারটা। এদিকে লঞ্চের মেশিন দিয়ে টকিহলের মেশিন হবে কিনা তার-ও ঠিক নেই। অবশ্য গোপাল মোক্তার মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন, হলে ভালো, সপ্তাহে একদিন থিয়েটার আর ছয়দিন টকি আর না হলে সপ্তাহজুড়ে সাতদিন ধরেই থিয়েটার করা যাবে, হলটা আগে হোক তো, থিয়েটার করতে আর মেশিন লাগবে না, হল হলে একবার দেখে নেওয়া যাবে জোয়াদ্দারপাড়ার বদমায়েসি।

সাহেবি কায়দা, মোক্তারি কসরত আর পোদ্দারের প্যাঁচ, এই তিন মিলিয়ে এক ভীষণ জট পাকিয়ে গেলো, সে জট কিছুতেই খোলে না, আর এদিকে ন্যাশনালের লোকেরা অস্থির হয়ে উঠলো তারা হল হোক না হোক তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, এরা চায় থিয়েটার।

অনেক কথা চালাচালি ইত্যাদির পর স্থির হল কারোর নামেই হবে না, হলের নাম হবে মুনশাইন টকি হল মালিক হবে কেদার পোদ্দার ম্যাকিনতোষ আর ন্যাশনাল ড্রামাটিক একসঙ্গে। মাসে একদিন করে প্রথম রবিবারে থিয়েটার, যদি ম্যাকিনতোষের পোড়ো লঞ্চটা কোন কাজে না লাগে, সেটা যেভাবে সম্ভব বেচে দিয়ে তাই দিয়ে টকির সব যন্ত্রপাতি কেনা হবে।

খ্যাপা মহেশ ড্রাইভার রওনা হয়ে গেলো মানিকগঞ্জে সাকরেদ সঙ্গে নিয়ে। টকির যন্ত্রপাতি দেখে আসবে, সে কথা দিলো সাত দিনের মধ্যে ফিরে এসে জানাবে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, তিন সপ্তাহ গিয়ে এক মাস হতে চললো মহেশ আর ফেরে না, সবাই অধৈর্য হয়ে উঠলো। সকলের ধারণা হয়ে গেলো মহেশ ড্রাইভার ভেগেছে, কিন্তু তার সাধের

মোটরগাড়ি ফেলে সে কোথাও চলে যাবে এটা ভাবাও যেন যায় না। সান্যাল উকিলের বাড়ির কাঁঠাল গাছের তলায় আটাশ দিন ধরে এক নাগাড়ে 'গ্রেট বেঙ্গল একস্‌প্রেস' অর্থাৎ ক্ষ্যাপা ড্রাইভারের লড়ঝড়ে বাসটা অপেক্ষা করবার পর মহেশ সত্যি সত্যি ফিরলো, শেষরাত্রে অতীব গোপনে। প্রথমেই গিয়ে দেখা করলো গোপাল মোক্তারের সঙ্গে। দুজনে ঘরের দরজা বন্ধ করে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি সব আলোচনা করলো। কোনো যন্ত্রঘটিত ব্যাপারে এত গোপনীয়তার কি থাকতে পারে বোঝাই গেলো না।

দিন দশেকের মধ্যে শহরের রাস্তায় ব্যাণ্ড পার্টি বেরুলো, লাল কালিতে ছাপা হলুদ কাগজের হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হলো হাটে, বাজারে, রাস্তায় রাস্তায়।

—'দি মুনশাইন টকি কাম থিয়েটার হল।'

মাসে একদিন করিয়া ন্যাশন্যাল ড্রামাটিকের অভিনয়ের সঙ্গে ঊনত্রিশ দিন ব্যাপি টকি প্রদর্শনী।

আগামী শীতকালের পূর্বেই উদ্বোধন হইবে।

মুনশাইন ড্রামাটিক তথা সমগ্র মহকুমার গৌরব, পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনীয়।

স্বাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায়

মোক্তার ও ম্যানেজার, মুনশাইন।'

গোপাল মোক্তারকে কে মুনশাইনের ম্যানেজার করলো কিছু জানা নেই, কিন্তু এতে কেউ আর বিশেষ কোনো আপত্তি করলো না। সকলেই এই নতুন গৌরবে এত আহ্লাদিত ছিল যে গোপাল মোক্তারের ম্যানেজারিও অনায়াসেই হস্তগত হলো।

সিনেমা চালু করার কাজ শুরু হলো। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাকিনতোষের লঞ্চটা সেইরকমই পড়ে রইলো তার যন্ত্রপাতি খুলে সিনেমায় মেশিনে লাগানো হলো না।

এদিকে জোয়ারদারপাড়া কোথা থেকে গত সপ্তাহের এক সংখ্যা মানিকগঞ্জ সুসমাচার নিয়ে এসে কি সব কানাঘুষো করতে লাগলো,

তারপর একদিন টাউনের চৌমাথায় মোড়ে লটকিয়ে দিলো।

"তুঃসাহসিক চুরি"

গতকাল গভীর রাত্রিতে কে বা কাহারা মানিকগঞ্জে ফুলমনি টকি শো হাউসের ডায়নামো এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি লইয়া গিয়াছে। ঘটনাটি গভীর রাত্রিতে ঘটে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সপ্তাহ-চারেক হইল যে নবাগত তুই ব্যাক্তি সিনেমা হলের কর্মচারীদের সঙ্গে সিনেমার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিষয়ে বহু আলোচনাটি করিয়াছিলো তাহারাও নিরুদ্দেশ। সর্বশেষ খবরে জানা যায় শেষরাত্রির দিকে তাহাদের একটি নৌকায় করিয়া ধলেশ্বরীতে বাহির হইতে দেখা যায়।

জোয়ারদার পাড়ার বহুরকম বিরোধিতা সত্বেও কিন্তু মুনশাইন সিনেমা স্থাপিত হয়ে গেল। তারা নাকি মানিকগঞ্জ সিনেমা হল মালিকদের কাছে একটা উল্টো-পাল্টা চিঠিও দিয়েছিল, কি সব গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে, কিন্তু যে কারণেই হোক মানিকগঞ্জ ওয়ালারা এইরকম এক আন্তঃ-মহা ফৌজদারী কলহে অগ্রসর হতে ভরসা পায়নি।

মহেশ ড্রাইভার সিনেমা হলে অপারেটর হয়ে গেল। এখন থেকে সমস্ত লোকে তাকে মহেশ মেকানিক বলে সম্বোধন করে। যখন সে কোচম্যান থেকে ড্রাইভার হয়েছিল তখন কেউ ভুল করে বা ইয়াকি করে কোচম্যান বললে যেমন ক্ষেপে যেত তেমনি এখন কেউ তাকে ড্রাইভার বলে দেখুক না। ড্রাইভারী গেছে কিন্তু সেই লোহার হ্যাণ্ডেল যেটা দিয়ে স্টার্ট নেবার আগে হ্যাণ্ডেল মারতো সেটা সে কাছছাড়া করেনি। সেই হ্যাণ্ডেলের জন্যেই হোক বা খ্যাপা মহেশের বাস্তবিক যোগ্যতার জন্যেই হোক অনতিকালের মধ্যে মহেশ ড্রাইভার লোকমুখে মহেশ মেকানিক হয়ে গেল।

কেদার পোদ্দারের পাটগুদামে মুনশাইন সিনেমা চালু হল। বর্ষাকাল ছাড়া এমনি খুব অসুবিধা হত না, বর্ষাকালে একেকদিন সন্ধ্যার বা বিকেলের দিকে নদীতে জোয়ার আসত, ম্যানেজারের ঘরের জানালা দিয়ে গোপাল মোক্তার তখন জলের উদ্দামতা পর্যবেক্ষণ

করতেন, যখন মনে করতেন বিপদের সীমানা অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে, তিনি অপারেটরের ওখানে গিয়ে মহেশকে থামিয়ে দিতেন। তারপর যে ফোকর দিয়ে সিনেমার ফোকাস করা হত, সেখান দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঘোষণা করতেন, 'প্রিয় দর্শকবৃন্দ, নদীতে জোয়ার এসে গেছে, আপনারা সবাই মেজে থেকে পা তুলে নিজ নিজ আসনে হাঁটু মুড়ে বসুন। কোন গোলমাল করবেন না, এখুনি আবার শো শুরু হচ্ছে।'

একটু পরেই নদীর জল পাড় উপছিয়ে হলের মধ্যে ঢুকে পড়তো, একেক দিন এমন হতো যে হাঁটু অবধি জল উঠে সিট ভিজে যেত। সেদিন আরেকবার গোপাল মোক্তারের ঘোষণা শোনা যেত।

'অনিবার্য কারণবশত আজ প্রদর্শনী বন্ধ করা হল। আগামীকাল প্রথম থেকে এই শো দেখানো হবে, এই টিকিটেই।'

বলা বাহুল্য ঘোষণার দ্বিতীয় অংশটির আকর্ষণ যথেষ্ট ছিল, সামান্য জোয়ারের জল হলের মধ্যে ঢুকে গেছে বলে আবার পরের দিন গোড়ার থেকে দেখা যাবে এই আনন্দেই দর্শকেরা ফিরে যেত।

কিছুকাল পরে আরও এক ধরনের অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, সেটা বৃষ্টি হলে হত। পুরানো পাটগুদামের চাল একদম ঝাঁঝরা হয়ে ফুটোফুটো হয়ে গিয়েছিল। রাত্রি পরিষ্কার থাকলে আকাশের চাঁদ তারা সব স্পষ্ট দেখা যেত, কিন্তু বৃষ্টির দিনে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ত হলের মধ্যে। গোপাল মোক্তারের উদ্ভাবনী শক্তির অভাব ছিল না। তিনি শ'খানেক টোকা, যাকে বাংলাদেশে আমাদের ঐ অঞ্চলে মাথাইল বলা হয়, তার বন্দোবস্ত করেছিলাম। মাত্র এক আধলা খরচ করে যে-কোন দর্শক সিনেমা চলাকালীন ঐ টোকাটি বৃষ্টির মধ্যে ব্যবহার করতে পারত। সিনেমা থেকে বেরুনোর সময় ফেরত দিয়ে গেলেই হত।

কিন্তু সততা চিরকালই দুর্লভ ছিল। গোপাল মোক্তারের পরিকল্পনা ধোপে টিকল না। অনেকে টোকা নিয়ে সরে পড়তে লাগল। এক বর্ষায় প্রায় চল্লিশটি টোকার হিসেব মিললো না।

৯ অথচ পুরানো টিনের চাল সারিয়ে দেখা গেছে, কিছু লাভ নেই।

এক জায়গা সারালে অন্য জায়গায় ফুটো বেরোয়। সারাতে গেলে সম্পূর্ণ চাল পাল্টে ফেলতে হবে, কিন্তু এত টাকা মুনশাইনের ছিল না। বর্ষাকালেও বন্ধ রাখার উপায় নেই। সেটাই ব্যবসার মরসুম। নদীতে বিকেলী নৌকো আসছে হরদম, পাট উঠছে, চারদিকে ব্যবসাপত্র জমজমাট। ধরতে গেলে পূর্ববঙ্গের সেই গঞ্জশহরে সারা বছরের অর্ধেক ব্যবসা বর্ষায় দু মাসেই হয়ে যায়। সুতরাং এ সময় হল বন্ধ রাখা যায় না।

কেদার পোদ্দার তখনো ধীরেসুস্থে বেঁচে রয়েছেন। গোপাল মোক্তার একদিন গেলেন তাঁর কাছে পরামর্শের জন্যে। কেদার পোদ্দার খুব মন দিয়ে গোপাল মোক্তারের কথাবার্তা শুনলেন, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহু প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে গোপালবাবু কাল আসুন।'

পরদিন যাওয়া মাত্র কেদার পোদ্দার সমস্ত সমস্যার সমাধান বাতলে দিলেন। এই সমস্যার যে এত সহজে সমাধান ছিল গোপাল মোক্তার তা ভাবতেই পারেন নি। পরদিন থেকে নিয়ম হল সেই এক আধলা ভাড়াতেই দর্শকদের ঢোকা দেয়া হবে কিন্তু জামিনস্বরূপ তাদের জুতো জোড়া হলের ম্যানেজারের কাছে জমা রেখে যেতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যারা খালি পায়ের দর্শক তাদের কি হবে? তাদের আর কি হবে তারা ভিজবে। যে খালি পায়েই হাঁটতে পারে, সে ভিজতেও পারে, ভিজলে তার কিছু আসে-যায় না।

*   *   *   *   *

উমাশশী-কাননবালায়
পাগল করেছে
মুনশাইন্ সিনেমায়
টকি এসেছে।

সেটা ছিলো টকির আদিযুগ। ছায়াছবি তখন সবে কথা বলতে শিখেছে। সেই যুগে আমাদের সেই মুনশাইন সিনেমার গোপাল মোক্তার এমন সব বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন, যা ভেবে আজকেও আমাদের

তাজ্জব লাগে।

গার্বো মানে গ্রেটে গার্বোর ইংরেজি বই, তখন খুব জমজমাট। তখন বাংলা বই বেশি ছিলো না। তাই মফস্বলেও প্রায় নিয়মিত ইংরেজি বইই দেখানো হতো। গ্রেটা গার্বোর কয়েকটা বই পরপর আনা হলো মুনশাইন সিনেমায়। আর তার প্রত্যেকটি থেকে গোপাল মোক্তার একটি আধটি ফিল্মের মাল সরিয়ে ফেললেন কি এক কৌশলে। বিলিতি কোম্পানিগুলো বুঝবার আগেই আমাদের মুনশাইন সিনেমায় গ্রেটার একটা অনন্যসাধারণ ফিল্ম রিলিজ করে গেলো।

খ্যাপা মহেশের বুদ্ধি ও প্ররোচনাতেই অবশ্য গোপাল মোক্তার এতটা সফল হতে পেরেছিলেন। গ্রেট গার্বোর সাতখানা বইয়ের দশটা রিল সরিয়ে তৈরি হলো সেই অসামান্য পূর্ণাঙ্গ চিত্র। শহরে চারপাশে পোস্টারে ছেয়ে ফেলা হলো, ম্যাকিনতোষ সাহেবের পরামর্শ নিয়ে নাম দেয়া হলো।

'মুনশাইন স্পেশাল গ্রেটা গার্বো,

লাস্যময়ী অভিনেত্রীর এই ফিল্ম প্রত্যেক রবিবারের ম্যাটিনিতে দেখানো হতো, আর ভিড় হতো অসামান্য। বইটির সামান্য কিছু ত্রুটি ছিলো। মহেশ আর গোপাল মোক্তার সেই ত্রুটিটুকু কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারেননি। একই বইয়ে তিনবার বিয়ে হলো নায়িকার, দুবার মৃত্যু হলো, আগের বইয়ে যিনি গার্বোর ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, পরের ফিল্মে তিনিই নায়ক। ফলে এই দুই ফিল্মের দুটি রিল পরপর দেখানোয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রেম ও বিয়ে হয়ে গেলো নায়িকার মানে গার্বোর। একটা বইয়ে ছিলো গার্বোর মুখে কি সব আঘাতের চিহ্নে বিশ্রী দেখাচ্ছে, গোপাল এই দৃশ্যের পরই দেখাতো চাঁদের নিচে দোতলার ব্যালকনিতে অনুপম মুখশ্রী নিয়ে গার্বো দাঁড়িয়ে, ঈষৎ হাওয়ায় তার সুন্দর চুলের গুচ্ছ কপাল থেকে উড়ছে।

এসব ব্যাপারে অবশ্য সেদিনের দর্শকেরা মোটেই আপত্তি করেননি। সেই গ্রেটা গার্বো সংকলন যদি আজো থাকতো তবে আজকের দর্শকেরাও দেখে আনন্দিতই হতেন। কেননা গোপাল মোক্তার আর

মহেশ গার্বোর শ্রেষ্ঠাংশগুলোই চুরি করেছিলো। গার্বোর অভিনয়ের অমন সুচিন্তিত সঙ্কলন পরিবেশন এক মফস্বলী মোক্তার আর অশিল্পী মেকানিকের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, একথা এখন আর বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মুনশাইন সিনেমায় অবশ্য এর চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার অনেক ঘটেছে। এবং তার অধিকাংশই গোপাল মোক্তার ও মহেশ মেকানিকের অনিচ্ছায় ঘটেছে।

ফোকাসের যন্ত্রটা হঠাৎ হটাৎই জোরে চলতে থাকতো, ফলে পাঁচ মিনিটের ছবি এক মিনিটে দেখানো হয়ে যেতো, একটা ছবির উপর আর একটা ছবি চেপে যেতো। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ দালান কোঠা ঘর বাড়ি, যাবতীয় অচল জিনিস ছুটতে শুরু করলে, নারকেল গাছ ছুটে এসে নায়িকার ঘাড়ে পড়লো, হাততালিতে প্রেক্ষা-গৃহ ভরে যেতো। খুশীমনে পাশের একান্তই অপরিচিত দর্শককে একটা জর্দা-পান খাইয়ে দিতো বাজারের মাছের ব্যাপারি। পাটের আড়ত-দার ইণ্টারভ্যালে বেরিয়ে চা মামলেট খাওয়াতো ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ম্যানেজার আর মেকানিককে।

যতগুলো ফিল্মের রিল ঠিক ততবার ইণ্টারভ্যাল হতো, কেননা মেসিন ছিলো মাত্র একটা, এক রিল ফুরিয়ে গেলে, আলো জ্বালিয়ে আরেকটা রিল পরাতে হতো মেসিনে। কারো আপত্তি ছিলো না তাতে, সেটাই ছিলো ঢিমে তেতালা, ধীরে সুস্থে সময় কাটানোর দিন। একটা দশ এগারো রিলের ফিল্ম দেখাতে পাঁচ ছয় ঘণ্টা লেগে যেতো। তা লাগুক।

'চাই চানাচুর, বাদাম ভাজা, পান বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি কোরাসে ইণ্টারভ্যালগুলি সরগরম হয়ে উঠতো। এমন কি ভিখিরিরাও ইণ্টার-ভ্যালের সুযোগে হলের মধ্যে ভিক্ষা করতে ঢুকে যেতো। ইণ্টারভ্যাল মানেই খোলা দরজা। টিকেট থাকুক আর না থাকুক, যে কেউ ঢুকতে পারে। বাইরে লেডিস গেটের সামনে বাড়ির চাকর বা আত্মীয়েরা ভিতরের দর্শিকা কারো কারো শিশু কোলে অপেক্ষা করতো। অনেক সময় কাঁদাকাটি করলে অন্যান্য দর্শকরা আপত্তি করায় এবং বাড়ির কেউ

উদ্বৃত্ত না থাকায় গেটকীপাররাও বাচ্চার জিম্মা নিতো। বিরতির সময় তাদের পৌঁছে দেওয়া হতো মায়েদের কাছে। কিঞ্চিৎ পরিচর্যা অন্তে বই আবার দেখানো শুরু হওয়া মাত্রই ক্রন্দন-পরায়ণ শিশুদের স্থানান্তরিত করা হতো গেটের বাইরে।

অধিকাংশ ছবিই বাক্যহীন তখনো, তবে দু-একটা খুব ছোটো দু-এক রীলের বাক্যবহুল ছবিও হচ্ছে।

নির্বাক ছবি থেকে সবাক ছবিতে উত্তরণ বিজ্ঞানের খুব বড একটা ব্যাপার কিনা জানি না, কিন্তু এতে মুনশাইন সিনেমায় দর্শকের একটা বিশেষ সুবিধা হয়েছিলো।

নির্বাক ছবিতে অনেক ঘটনা ছবির সঙ্গে লেখা থাকতো, যেমন ছবিতে দেখানো হলো অন্ধকার হয়েছে, পাখি উড়ছে তারই সঙ্গে মন্তব্য লেখা থাকলো 'সন্ধ্যা হইলো,' কিংবা খুব ভিড় দেখানো হলো, আদালতের বাড়ি, পাশে লেখা 'আদালতে হাকিমের ঘরে সেদিন খুব ভিড়।'

মুনশাইন সিনেমার দর্শকেরা এখানকার এবং তখনকারও অন্যান্য হলের মতই পর্দার সামনের দিকেই বসতো। কিন্তু এক সময় ভিড় খুব বেশি হয়ে যেতো। হাউসফুল ব্যাপারটা মুনশাইনের ছিলো না। সিট ভরে গেলে লোকজন দাঁড়িয়ে দেখতো। তারপরে পর্দার পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াতো। পর্দার পিছন দিকে কিছুটা জায়গা ছিলো। কেননা ওটাই ছিলো থিয়েটারের স্টেজ। ড্রপসিনের ওখানে সিনেমার পর্দা গোপাল মোক্তারের ওজস্বী ভাষায়, উজ্জ্বল রূপালী পর্দা ঝুলতো। ভিড় বাড়ালে এই পর্দার পিছনে স্টেজের ওপর যেখানে থিয়েটারের সময় পাত্র-পাত্রীর স্থান সেখানে দর্শকদের স্থান হতো।

নির্বাক যুগে এই ব্যবস্থার একটা অসুবিধা ছিলো। পর্দার উল্টোদিকে যারা দাঁড়াতো তাদের লেখাগুলো পড়তে অসুবিধা হতো, কেননা ঐ মন্তব্যগুলি বিপরীত দিকে দেখা যেতো। অনেকের অবশ্য অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো উল্টো লেখা পড়ার। কিন্তু কিছু নতুন লোক অনেক সময়েই থাকতো।

এ অবস্থায়ও অবশ্য ম্যানেজার গোপাল মোক্তারের বুদ্ধির অভাব হয়নি। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের সামনেও যা পিছনেও তাই। তারা পর্দার পিছন দিকে দাঁড়াবে আর সামনের দিকে মা জননীরা এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা। এই সময়ে মুনশাইন সিনেমার হ্যাণ্ডবিল বেরুতো, তার নীচে বড় বড় অক্ষরে বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা থাকতো।

'অশিক্ষিত ও নিরক্ষরদের জন্য সুবন্দোবস্ত আছে',

গোপাল মোক্তারের এই বুদ্ধি কিন্তু মুনশাইনের কিছু ক্ষতিই করলো। লোকে কেন টিকিট কেটে নিরক্ষর হতে যাবে। পর্দার পিছন দিকে আগে সাক্ষর যারা দাঁড়াতো তারাও অশিক্ষিতদের দলে পড়ে যায় ভয়ে ক্রমশ সরে পড়লো। দু-চারজন চাষাভুষা ছাড়া আর কেউ পর্দার পিছন দিকে দাঁড়াতো না।

সবাক ছবি এসে মুনশাইন হলের বিরাট উপকার করলো। তখন আর কিছু লেখা নেই, পড়াশোনার বালাই নেই, এখন শুধু দেখা শোনা। পর্দার যেদিকেই দাঁড়াও।

পর্দার পিছন দিকে ছবির অত কাছাকাছি থেকে দেখে খুব ভালো লাগতো, দৃশ্য ইত্যাদি অস্পষ্ট, ঝাপসাও দেখাতো কিন্তু সে আমলের বিশেষ করে মুনশাইনের দর্শকেরা এসব বিষয়ে কোনোদিনই খুব মাথা ঘামায়নি। সমস্ত টিকিটের দাম ছিলো সোজা তিন আনা। বিশিষ্ট দর্শক আর মহিলাদের জন্য কিছু চেয়ার ছিলো, ঐ একই দামে, আর অন্যান্যগুলি বেঞ্চ, কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন কোনো আপত্তি ওঠেনি।

গোলাপী, ফিকে নীল, হলুদ এইরকম নানারকম রং-এর সব ঘুড়ি তৈরির কাগজে বাজারের দিনে দুপুরবেলায় টমটম গাড়িতে করে হ্যাণ্ডবিল ছড়াতো মুনশাইন সিনেমার প্রচার দপ্তর। টমটম গাড়ির পিছনে থাকতো ব্যাণ্ডপার্টি, তার মহারানী ভিক্টোরিয়ার করোনেশনের বাজনা বাজাতো। সেই টমটম গাড়ি আর ব্যাণ্ডপার্টির সঙ্গে থাকতো একটা অনাহুত মিছিল। ষাট-সত্তরটি নগ্ন বা অর্ধনগ্ন বালক-বালিকা জনতিনেক স্থানীয় ভবঘুরে আর উৎসাহী নেড়িকুকুর চার পাঁচটা।

সেই হ্যাণ্ড বিলগুলি সিনেমার ম্যানেজারি প্রাপ্ত একজন মফস্বলী মোক্তারের সাহিত্য-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন :

'পাষণ্ড' পতির আত্মসমর্পণ, সতী-সাধ্বীর চরম আত্মত্যাগের লোমহর্ষক কাহিনী। দেখিতে দেখিতে হাস ভুলিয়া যাইবেন। ক্রন্দন ভুলিয়া যাইবেন। দুঃখ-সুখ ভুলিয়া যাইবেন চিত্তপটে মাত্র কটি মুখ থাকিবে, সে মুখ কার—

'সে মুখ নলিনীবালার'

আরেকবার নলিনীবালাকে দর্শন করিতে ভুলিবেন না।'

যেরকম ঝড়ে মুনশাইন সিনেমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, মুনশাইন সিনেমার কাল হয়েছিলো তাতেই। পূর্ববঙ্গের নদীর তীরের খ্যাপা হাওয়া, বার বার হলের ক্ষতি করেছে। ছ'খানা করোগেট সিট উড়িয়ে নিয়ে গেলো চৈত্র মাসের আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে। তখনো বর্ষা আসতে ঢের দেরী। মন্দা ব্যবসার সময় সেটা, গোপাল মোক্তার আর টিন না লাগিয়ে একটা ত্রিপল লাগিয়ে দিলেন ফাঁকা জায়গাটায়।

জ্যোৎস্নারাতে ভারি হাওয়া থাকলে ত্রিপলটা পত্ পত্ করে উড়তো, ফলে জ্যোৎস্না, ম্যাকিনতোষসাহেবের মুনশাইন, এসে পড়তো হলের মধ্যে। মুনশাইন নাম সার্থক হয়েছিলো।

তারপরে আরেকবারের ঝড়ে, সেই উনচল্লিশ সালের প্রলয়ঙ্কর বাত্যা, যাতে জগন্নাথগঞ্জের বিরাট জাহাজি স্টিমারটাই ডুবে গিয়েছিলো, সেই ঝড়ে মুনশাইন সিনেমা একেবারে উড়ে গেলো, আর পড়লো নদীর মধ্যে। শ্রাবণ মাসের উদ্দাম নদীর গর্ভ থেকে কিছুই উদ্ধার করা গেলো না।

তবু মহেশ আর তার সাকরেদরা চেষ্টার ত্রুটি করলো না। সারাদিন-রাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে যখন কিছুতেই মেশিনের একটা টুকরোর পাত্তাও মিললো না, তখন দুজনের ডবল নিউমোনিয়া হয়ে গেছে, একজন তো বাঁচলোই না। বাইম মাছ না কি একটা জংলি মাছে মহেশের হাঁটুতে এমন ঠুকরে দিলো সারাজীবনে সে ঘা শুকালো না। সারাজীবনে বলা বোধহয় ঠিক হলো না, কারণ মুনশাইন অবলুপ্ত বা

নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার পর মহেশ আর ছ'মাসও শহরে থাকেনি। মদে-মাংসে পর্যন্ত অরুচি ধরে গিয়েছিলো তার। তারপর একদিন কানা ম্যাকিনতোষের সঙ্গে একটা পুরানো লঞ্চে উঠে কোথায় যে চলে গেলো। তখন মহাযুদ্ধ প্রায় শুরু—লোকে বলতো তুজনেই যুদ্ধে গেছে।

মহেশ মেকানিকের কতকগুলো ব্যাপার আজো বুদ্ধির অগম্য রয়ে গেছে।

প্রজেক্টারে কি যে গোলমাল হলো; মহেশ একদিন তুপুরবেলায় সব প্যাঁচ, স্ক্রু, বল্টু নাট খুলে তেল মাখালো, তারপর আর কিছুতেই লাগে না। তিনটে পার্টস ছুঁড়ে ফেলে দিলো নদীর জলে। সাকরেদরা মহেশকে স্যার বলতো। তারা কি করেন স্যার, কি করেন স্যার' করে চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু মহেশ তখন খেপে গেছে, 'আমার সঙ্গে চালাকি!'

এই রকমই স্বভাব ছিলো মহেশের। একটা পুরানো শাড়ি, কয়েক গজ ছেঁড়া তার আর একটা লোহার হাতুড়ি সম্বল করে সে ছিলো অপারেটর-কাম-মেশিনম্যান-কাম মেকানিক। চোখ বুঁজে যন্ত্রের মধ্যে হাত চালিয়ে যা হাতের কাছে পেতো একটানে খুলে সেখানে সামান্য এক টুকরো তার জুড়ে দিয়ে প্রজেক্টারের ভাঙা লেন্সে সেলোফিন কাগজ লাগিয়ে খুচ করে হাতুড়ি দিয়ে তুমদাম ঠুকে দিতো। তারপর কালিমাখা ময়লা হাতটা মুছে ফেলতো ময়লা ছেঁড়া শাড়িটায়। ঐ ময়লা ছেঁড়া শাড়িটা নাকি ছিলো মহেশের অনুপ্রেরণা, মানিকগঞ্জের স্মৃতিচিহ্ন। মেশিনঘটিত ব্যাপারে ঐ শাড়ির মালিকান তাকে সাহায্য করেছিলো পালিয়ে চলে আসতে। মহেশকে কিন্তু এসব ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে তুরন্ত চটে যেতো। লোকে ভয় পেতো কি জানি ঘাড়টা ছিঁড়ে ফেলে তার দিয়ে বা সেলোফেন পেপার দিয়েই হয়তো জুড়ে দেবে। তখন কি আর চলবে।

মেশিন কিন্তু চলতো। ঠিক চলতো বলা উচিত হবে না, তবে

চলতো। আর সেই মেশিনেই মহেশ প্রমাণ করেছিলো বিজ্ঞানের সেই তথ্য যে আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত। যে কারণে বজ্রগর্জন শোনার আগে আমরা বিদ্যুৎ-চমক দেখতে পাই, সেই কারণেই অসম্ভব সব ঘটনা সম্ভব হয়েছিলো মুনশাইন সিনেমায়।

কি জানি কেন প্রজেক্টারে, না অন্য কোন্ মেশিনে কি গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো। পর্দায় ছবি পড়তো, ছবির পাত্র পাত্রীদের ঠোঁট নড়তো কিন্তু শব্দ বেরুতো দু'-তিন মিনিট পরে। দু' মিনিট আগে নায়িকার জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, এই দু' মিনিটে ছবিতে ছয় মাস কেটে গেছে, নায়ক-নায়িকা সকালের আলোয় হাত ধরাধরি করে নদীর তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের ঠোঁট সঞ্চালন দেখে অনুভব করা যাচ্ছে কোনো দ্বৈত প্রেমসঙ্গীত হচ্ছে কিন্তু তখন শোনা যাচ্ছে দু' মিনিট আগের সেই অবরুদ্ধ মড়াকান্না।

সন্ধ্যাবেলা, চাঁদ উঠলো বাঁশগাছের আড়ালে, নদীতে অন্ধকারে দুই-একটা ইতস্তত নৌকা, পরিপূর্ণ সায়াহ্নের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন চিত্র-পরিচালক, পর্দার ছবিতেও সেটা বেশ স্পষ্ট কিন্তু কার যেন খন্‌খনে গলায় শোনা যাচ্ছে, 'এই গন্‌গনে রোদ্দুরে আর চলতে পারছি না।' দর্শকদের স্মরণ রাখতে হতো যে, দু'মিনিট আগের মধ্যাহ্ন-কালের ডায়ালগ।

ডায়ালগ আর ছবি কিছুতেই মিলতো না মুনশাইনের পর্দায়। তাই বই শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও দু' মিনিট দর্শকেরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন; কেননা, পর্দায় ছবি মুছে যাওয়ার পরও ডায়ালগ চলতো, আর শেষ দৃশ্যের ডায়ালগ—সে কি মিস্ করা চলে।

কেউ যদি এমন থেকে থাকেন যিনি ১৯৩৩ সালের শীতকালে কোনো এক রাত্রিতে মুনশাইন সিনেমা যে গঞ্জ-শহরের নদীর তীরে ছিলো সেই শহরেই নাটমন্দিরে 'দুঃশাসনের রক্তপান' পালা দেখেছেন, তবে তাঁর নিশ্চয়ই মনে আছে।

মনে না থাকার কথা নয়। এরকম আরো বহু কথা নিশ্চয় তাঁর স্মরণে আছে। স্বল্পসংখ্যক পেট্রম্যাক্স বাতির অপরিচ্ছন্ন আলোর এক-

মফস্বল শহরের আটচালা নাটমন্দিরের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে যে অলৌকিক নাট্যরস পান করা গেছে সে খুব সহজে ভোলা যাবে না, আর ভোলার প্রয়োজনই বা কি?

মুনশাইন সিনেমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোয়ারদারপাড়া, সিনেমা-হল আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অসুবিধা ছিলো নাটমন্দির নিয়ে। বর্ষার শেষ থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত, এমন কি দোলপূর্ণিমার মেলা পর্যন্ত যাত্রা বসতো নাটমন্দিরে। প্রায় নিয়মিত যাত্রা বসতো। বলাবাহুল্য কিছু দর্শক এইভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো, এবং যাত্রাপালার প্রতি আকর্ষণও কিছু কম ছিলো না।

তবে একটা ব্যাপার এই ছিলো যে যাত্রা আরম্ভ হতো গভীর রাত্রিতে, অনেক সময়েই রাত বারোটার পর, তখন মুনশাইনের শো শেষ হয়ে যেতো। এমনও হতো অনেকে মুনশাইনে সিনেমা দেখে তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে যাত্রা দেখতে যেতো নাট-মন্দিরে।

যাত্রা দেখতে নগদ পয়সা লাগতো না, তাই ভিড় হতো খুব বেশি। তবে গঞ্জের ধনী-দরিদ্র জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকেই অল্প-বিস্তর চাঁদা দিতে হতো। যাত্রার ব্যয়নির্বাহ বাবদ নাটমন্দিরের তরফ থেকে সব প্রতিষ্ঠাবান ভদ্রলোকেরা চাঁদা আদায় করতে বেরোতেন দল বেঁধে। বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে তাঁরা হানা দিতেন পল্লীতে, বাজারে, সরকারী কোয়ার্টার এলাকায়। নাটমন্দিরের পৃষ্ঠ-পোষক প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা এই সিনেমা ব্যাপারটা খুব সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সিনেমা দেখতে নিরুৎসাহ করতেন। কিন্তু এমন-ও ছিলো যে তাঁরাই আবার কেউ কেউ প্রায় গোপনে বা প্রকারান্তরে মুনশাইনে ভিড় বাড়াতেন।

নাটমন্দিরের যাত্রার যে বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে সেটাকে আরো একটু রঞ্জিত করা যেতে পারে।

পালা হচ্ছে দুঃশাসনের রক্তপান'। শেষ দৃশ্য ঘনিয়ে এসেছে।

শেষ দৃশ্যে দুঃশাসনের একটি বিরাট স্বগত-উক্তি, তার পরে ভীম ছুটে যাবে মঞ্চের উপর, গিয়ে দুঃশাসনের বুকের ওপর চেপে বসবে বজ্রগর্জনে।

যাত্রার স্টেজ যেমন হয়, চারদিকে দর্শকেরা ঘিরে বসে আছে। নাটমন্দিরের পিছন দিকে অস্থায়ী চালাঘরে সাজঘর, সেখান থেকে দুটো লম্বা দড়ি টেনে প্যাসেজ রাখা হয়েছে স্টেজের সঙ্গে, সেই প্যাসেজ দিয়ে পাত্রপাত্রীর যাতায়াত। দর্শকের ভিড় হয়েছে খুব, পাগলা যাকে বলে একেবারে জমজমাট। প্যাসেজের মাঝামাঝি গদা হাতে নৃশংস মূর্তি কপালে তিলক আঁকা ভীম প্রতিজ্ঞা করছে, দুঃশাসনের স্বগত-উক্তি শেষ হলেই ছুটে মঞ্চের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে অত্যাচারীর ওপর। দুঃশাসনের স্পিচটা এখানে একটু বড়, প্রায় ছয়-সাত মিনিট, ভীম প্যাসেজে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে পায়ের কাছে অর্ধেক-ও পোড়েনি এরকম একটা বড় বিড়ি কুড়িয়ে পেলো। দুটো টান দিয়ে নিলে হয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে পায়ের নিচ থেকে পোড়া টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা জোর টান দিলো ভীম, না, নিবে গেছে একদম, ধোঁয়া বেরোচ্ছে না।

পাশের লোকটির কাছে দেশলাই চাইলো। 'অভিনেতা দেশলাই চেয়েছে, কৃতার্থ হয়েই দেয়ার কথা, কিন্তু সেটা সেই ত্রিশের দাম বাড়তির বাজার; তা ছাড়া দেশলাই বাজারে প্রায় পাওয়াই যায় না। লোকে আবার চকমকি পাথর ব্যাবহার শুরু করেছে, সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও একটু ইতস্তত করে দর্শকটি দেশলাই পকেট থেকে বার করলো।

ভীম বিড়ি ধরাতে যাবে, হঠাৎ সর্বনাশ, দুঃশাসন পার্ট মিস করেছে, প্রায় দুমিনিট সময়ের স্পিচ বাদ দিয়ে গেছে, এইবার-ই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, দুঃশাসনের উপর। পোড়া বিড়ি, দেশলাই তাড়াতাড়ি ট্যাঁকে গুজেঁ ভীম ছুটলো স্টেজের ওপর। দর্শকটি প্রথমে এইভাবে দেশলাইচ্যুত হয়ে হতবাক হয়ে গেলো, তারপরে সেও কর্তব্য স্থির করে ফেললো। স্টেজে ভীমের পিছে সেও ছুটলো।

তারপরে ধরাশায়ী দুঃশাসন, তার উপরে ভীম আর ভীমের আস্ফালন আর তার উপরে সেই দর্শক, 'ও মশায়, আমার দেশলাইটা?'

দুদিনে একটা দেশলাই, পুরোপুরি দু' পয়সা দাম, সেটা এতো সহজে হাতছাড়া করতে রাজি নয় দর্শকটি। ভীম অগত্যা দুঃশাসনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে কাপড়ের গিঁট খুলে দেশলাইটা বার করে দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো দুঃশাসনের ঘাড়ে, 'রে পাষাণ্ড! স্মরণ কর একবার সেই বস্ত্রহরণের কথা, সেই, দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচারের কথা।'

এদিকে কাপড়ের গিঁট খুলে দেশলাই বার করে দেখার সময়, তার উপরে এই প্রচণ্ড ঝাঁপানিতে তার নিজেরই পরিধেয়ের কষি কখন আল্গা হয়ে গেছে মহারথী ভীম টেরও পায়নি। একই পালাই শুধু দ্রৌপদী নয় ভীমেরও বস্ত্রহরণ—এ দৃশ্য শুধু সেই নাটমন্দিরের মধ্যেই বোধহয় সম্ভব ছিলো।

যা ঘটলো তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। একালে ওরকম ঘটলে মঞ্চের বিদ্যুৎ-বাতি নিবিয়ে ভীমের লজ্জা-নিবারণ করা যেতো। কিন্তু একাধিক পেট্রম্যাক্স অচিরে নিবিয়ে ফেলা অত সহজ নয়। অধিকারী-মশায় কাছেই কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ছুটে স্টেজের ওপর এসে সকলের দিকে হাতজোড় করে, তারপর মহিলা দর্শকদের দিকে ফিরে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পিত কণ্ঠে অনুরোধ করলেন, 'মালক্ষ্মীরা, চক্ষু মোদন করুন।'

"এই ঘন দুর্যোগময়ী রজনী, চতুর্দিকে বৃষ্টির হায় হায় হাহাকার। বনের ওপর থেকে সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে এমন রাত্রিতে তোমাকে ছেড়ে শত্রুপুরীতে হানা দিতে যেতে হচ্ছে। রাণী বিলাসবতী, তোমার মন খারাপ করবে না।' রাজার ধীরোদাত্ত কণ্ঠের গমকে চারিপার্শ্ব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অদূরে মঞ্চের উপরে অধোবদনা রাণী বিলাসবতী, একটু পরে তিনি মাথা উঁচু করে বললেন, 'কেন করবে রাজা? আমি ক্ষাত্র রমণী, যতদিন তুমি শত্রুনিধন না করে ফিরে ফিরে আসবে ততদিন আমি……'

ততদিন রাণী বিলাসবতী কি করবেন সেটা জানানোর আগেই বিলাসবতীর নজরে এলো স্টেজের ওপরে দুটো পেট্রোম্যাক্সের আলোর

একটা খুব ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে, প্রায় নিভেই এলো বলা যায়। ডায়লগ একটু থামিয়ে ধীর পদক্ষেপে সম্রাজ্ঞীজনোচিত নম্রতা ও ব্রীড়ার সঙ্গে তিনি হ্যাসাকের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর অভ্যস্ত ক্ষিপ্র হস্তে হ্যাসাকটি পাম্প করতে লাগলেন, ডায়লগও চলতে লাগলো। পাম্পের জোরে আলো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো, আর রাণী বিলাসবতী বলে চললেন, 'ততদিন আমি বিনিদ্র-রজনী-দিবস তোমারই জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো। এই বাতায়নের পথে আমার দৃষ্টি....' ইত্যাদি ইত্যাদি।

হ্যাসাক পাম্প করাও যেন অভিনয়ের অন্তর্গত কোন ব্যাপার দর্শকরা এই নিয়ে কোনো মাথা ঘামাতো না। নায়ক-নায়িকা কেউই বিচলিত বোধ করেনি।

মঞ্চের উপরে সতরঞ্চ বা চট একটু গুটিয়ে গেছে, মৃত সেনা নায়কের পিঠে একটু টান লাগছে, তিনি আর কি করবেন সামান্য নড়েচড়ে পিঠের নিচের থেকে সতরঞ্চটা একটু সরিয়ে ঠিকমতো বিছিয়ে দিলেন। এতে নাট্যরস একটুও ব্যাহত হলো না।

*　　　*　　　*

সবই অবাস্তব, সবই অসম্ভব। মুনসাইন সিনেমার সবকিছুই যেমন অবিশ্বাস্য তেমনই নাটমন্দিরের নাচ-গানের সব ঘটনাই অলৌকিক। মাত্র ত্রিশ বছরে সব এমন বদলিয়ে গেলো। নিজেদেরই আর বিশ্বাস হয় না, স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী, ইতিহাস-ভূগোল সমস্ত পরিচিত জগতের সীমানা এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেলো এই তিন দশকের মধ্যে।

বলু আর পটু অর্থাৎ বলাই সাহা আর পটল পাল অর্থাৎ নাটমন্দিরের সমস্ত পালাগানের সেই দুই গুলিখোর অসম্ভব উৎসাহী শ্রোতা, সেই বলু আর পটুর কথা আজ আর কেউ কি বিশ্বাসযোগ্য মনে করতে পারে? আমরা যারা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে এসব ঘটনা শুনেছি আমরা কিন্তু বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ, কিছুই অসম্ভব ছিলো না; অনিদ্র, অক্লান্ত দর্শকমণ্ডলী সমস্তই নিজগুণে মেনে নিয়েছিলো, সহ্য করে স্বীকার করে নিয়েছিলো।

নাটমন্দিরের সমস্ত যাত্রার আসরের প্রথম সারির শ্রোতা ছিলো এই দুজনে, এই বলু আর পটু। এদের দুজনকে নিয়ে কর্মকর্তাদের মাথাব্যথা কিছু কম ছিলো না। কিন্তু প্রথম সারির থেকে এদের সরিয়ে নিয়ে আসা ছিলো অসম্ভব। তাহলে হুলুস্থুল হয়ে যাবে। দুই গুলিখোরে এমন কাণ্ড বাধাবে যা থামাতে গিয়ে পালা ভেঙ্গে যেতেও পারে। এরকম হয়েছেও একাধিকবার।

সুতরাং কড়া নজর রাখা হতো এদের দুজনের দিকে। দুজন ষণ্ডামার্কা লোক এদের দুপাশে গিয়ে বসে পড়তো, কর্মকর্তাদের নির্দেশ, 'একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখবি। দেখবি স্টেজের ওপরে না উঠে যায়।'

কিন্তু তবু কি করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মোক্ষম দৃশ্যে এরা দুই অভিন্নহৃদয় সুহৃদ মঞ্চে চলে যেতো।

'মথুরা-বিলাস পালা। শ্রীরাধিকা গাগরীভরণে চলেছেন, কনসার্ট বাজছে নৃত্যের তালে। একাকিনী শ্রীরাধিকা, আধা-পুরুষালি, আধা-মেয়েলি, গলায় ঘুরে ঘুরে গাইছেন, 'লাজ বড় পরাণে,। হঠাৎ কোথা থেকে কি, তার দুই পাশে দুই গুলিখোর উঠে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। হৈ-হৈ কাণ্ড. নাচ বন্ধ, দুই বন্ধুকে ঘাড়ে ধরে নামিয়ে নিয়ে আসা হলো। 'এসব বদমায়েসির মানে কি?' গর্জন করে উঠলেন নাটমন্দিরের সভাপতি সান্যাল মশাই। বলু আর পটু বললো, 'সখী, সখী।'

সখী ছাড়া কি নাচ জমে? পটু-সন্তুর বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট, একাকিনী শ্রীরাধার সখীর ভূমিকায় স্থান পূরণ করতে তারা মঞ্চে উঠেছিলো।

কর্ণার্জুন পালা। মুখোমুখি দুই মহাবীর কর্ণ আর অর্জুন। দুজনের হাতে শাণিত অস্ত্র, মুখে শাণিত ডায়লগ। এরই মধ্যে সহসা কখন কর্ণ আর অর্জুন দুজনেরই অজ্ঞাতে, এমন কি বোধহয় সমস্ত দর্শকের অগোচরে পটু আর বলু হামাগুড়ি দিয়ে স্টেজে উঠে গিয়েছে।

ঐ হামাগুড়িরত অবস্থাতেই কর্ণ বা অর্জুন কাউকেই বিশেষ কিছু

বুঝবার অবকাশ না দিয়ে দুই যুদ্ধরত মহাবীরের পায়ের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছে এই দুই গুলিখোর আর 'ঘুড়া ঘুড়া' বলে চেঁচাচ্ছে।

'ঘুড়া' অর্থাৎ ঘোড়া ছাড়া কি যুদ্ধ হয়। তাই সেই ঘোড়ার অভাব দূর করতে দুজনে মঞ্চে হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদরূপে প্রবেশ করেছে। পশ্চাৎদেশ থেকে এই অভাবিত আক্রমণে হঠাৎ চমকে উঠে অর্জুন 'ওরে বাবারে গেছিরে' একলাফ দিয়ে পড়লো দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে। আর কর্ণ বেচারা টাল সামলাতে না পেরে প্রথমে মঞ্চে, তারপরে মঞ্চ থেকে গড়িয়ে সোজা মহিলাদের সারির প্রথমে সান্যাল মশায়ের শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা পিসিমার কোলে গিয়ে পড়লো।

অবস্থার গতিক ক্ষণেকের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করে পটল পাল আর বলাই সাহা পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করার জন্য পলায়ন-তৎপর হয়ে উঠলো।

কিন্তু তখন তারা পালায় কার সাধ্যি ?

আচাফালায়া একটি নদীর নাম

আচাফালায়া, একটি নদীর নাম।
আচাফালায়া তুমি সেই নদী,
সেই বুনো জলাভূমি
যার প্রাচীন সাইপ্রেস গাছের ডালে
ঝুলন্ত শ্যাওলা শান্ত বাতাসে
কেবলই কাঁপছে।

আচাফালায়া হেমন্তের দুপুরবেলায় তুমি
ক্রিস্‌মাস গাছের মতো উজ্জ্বল
পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাওয়ায়
সাইপ্রেসের কালো সবুজ পাতা
পুরনো দিনের মতো উড়ছে।

এদিকে শীতের দিন এসে গেল,
তুমি ক্রমশঃ শুনতে পাচ্ছো
বনসারসের কলধ্বনি, আচাফালায়া,
সুন্দরীতমা, এবার সবাইকে কাছে ডাকে।

এইতো আবার বসন্ত আসছে,
আচাফালায়া,
তোমার সদ্যজাত হরিণ শিশুর মতো
তুমিও চঞ্চল
এমন কি তোমার কুয়াশা ঘেরা
শান্ত ভোরবেলা
সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে পাখির গানে।
এবং তারো পরে একদিন গ্রীষ্ম এসে যায়
আচাফালায়া তোমার সবুজ চড়ায়
একটা অলস কুমীর রোদ্দুরে শুয়ে থাকে,
থাকুক, ও ঐ ভাবেই থাকুক।
তোমার মতো, তুমি থাকো আচাফালায়া।

॥ দুই ॥

এই পৃথিবীতে কোথাও আচাফালায়া নামে এক নদী আছে। নদীর নামেই জায়গার নাম। ভুবনবিখ্যাত মিসিসিপি নদীর থেকে খুব দূরে নয় আচাফালায়া আমেরিকায় লুইসিয়ানা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে জলাভূমি আর মেছোঘেরি ঘুরে ছোট স্থানীয় নদী আচাফালায়া গিয়ে নেমেছে মেকসিকো উপসাগরে। আচাফালায়া নদী ও মেকসিকো উপসাগরের মধ্যবর্তী অববাহিকার নামও ঐ আচাফালায়া!

মেকসিকো কিংবা আরো দূরবর্তী অঞ্চল থেকে উত্তাল উপসাগর পাড়ি দিয়ে আগের দিনের লাল মানুষেরা মাছ, ফসল ও কাঠের খোঁজে আচাফালায়ার জলাভূমিতে প্রবেশ করেছিলো, তাদের নৌকো বেঁধেছিলো সাইপ্রেস গাছের নিচে, সে নিশ্চয় বহু শতাব্দী আগেকার কথা

তারপর একদিন সাদা মানুষেরা এলো, মূলত ফরাসী পত্তন হয়েছিলো মেকসিকো উপসাগরের উত্তর তীরের আমেরিকায়। এখন তো মাছ, চিংড়ি আর সামুদ্রিক তেলের ফলাও কারবারে জমজমাট হয়ে উঠেছে জলাভূমি, তেলের জাহাজ আর মাছের ট্রলারে সমুদ্রতীর চঞ্চল। দীর্ঘ হাইওয়ে, হোটেল, দোকান, ফ্যাকটরি আর জনবসতির আড়ালে হারিয়ে গেছে আচাফালায়া জলাভূমি।

শুধু আচাফালায়া নামটি রয়ে গেছে। সেই প্রাচীন সাইপ্রেস গাছগুলি, যাদের বলা হতো গাছেদের রাজবংশ, গত শতাব্দীর কাঠু-রেদের হাতে তারা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। শুধু এখানে ওখানে ইতস্তত দু একটি মহাকায় বৃক্ষদৈত্য স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে রক্ষিত হচ্ছে। আর রয়ে গেছে ঝুলন্ত শ্যাওলা বা হ্যাংগিং রস। অনেকটা আমাদের দেশের আলোক-লতার মতো তবে সোনালি নয় সবুজ, এদের মাটিতে কোনো শিকড় নেই, হাওয়ায় উড়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছে ভেসে যায়। বহু কষ্টে রক্ষা করা পুরোনো দিনের স্মৃতিবাহী দু একটি হরিণ, দু একটি কুমীর, কিছু জংলি লতাপাতা দুএকটি পুরোনো কুঁড়েঘর, কাঠের নৌকো আচাফালায়া এক সাজানো বাগানে কোনক্রমে টিকে আছে।

সেই বাগানে একবার ঢোকার পরেই কেমন যেন মনে হয় চেনা-চেনা, আগে কি এখানে এসেছিলাম ?

॥ তিন ॥

আচাফালায়ার নতুন নাম মর্গান সিটি যদিও নামে মর্গান সিটি কিন্তু আসলে বোধ হয় সিটি নয়, এক লক্ষ লোক আছে বলে মনে হয় না। শহরটা একটু ছড়ানো ছিটানো। শহরের অর্ধেক উত্তেজনাই সমুদ্রতীরে। প্রধান ব্যবসা চিংড়ী ও নানা সামুদ্রিক মাছ নিয়ে। রঙীন পাল তুলে সমুদ্রের জলে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচছে যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকো, তারা তাদের শহরের নাম দিয়েছে মর্গান সিটি শিল্প ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্ল্ড, বাংলায় কথাটা হাস্যকর শোনোবে, চিংড়ি মাছের রাজধানী।

মর্গান নগরের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে মাত্র দু বছর আগে। জলাভূমির

এই গঞ্জশহর পত্তন করেছিলেন ডাঃ ওয়ালটার ব্রাশার নামে এক আখ ব্যবসায়ী। তখন তাঁরই নামে গঞ্জের নাম হয়েছিলো ব্রাশার। সেটা ১৮৬০ সালের কথা। এর ষোল বছর পরে ১৮৭৬ সালে শহরের নাম পালটে গেলো চার্লস মর্গানের নামে। চার্লস মর্গান ছিলেন এক ভাগ্যান্বেষী ব্যবসায়ী, রেলগাড়ি আর জাহাজের ব্যবসায় একদিন তিনি পৌঁছেছিলেন ব্রাশার শহরে, বণিকতন্ত্রের সেই সুবর্ণযুগে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বিস্তারিত তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতাদের মতই। কিন্তু ব্রাশারকে মর্গান সিটি ভোলে নি। মর্গান সিটির সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন ফোর্ট ব্রাশার আজো তাঁকে স্মরণ করছে।

মর্গান নগর বিখ্যাত নিউ অরলিন্‌স শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে, নব্বুই নম্বর আমেরিকান হাইওয়ের উপর। মিসিসিপি নদীর উপর দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ হাইওয়ে। এই হাইওয়ে ধরে অসংখ্য লোক প্রত্যেক বছর মর্গান সিটিতে যায় কেউ যায় জলাভূমির বাগান দেখতে, কেউ সৌখীন মৎসশিকারী তাদের কাছে আচাফালায় অববাহিকা আজো মাছ ধরার স্বর্গ, কেউ যায় এখনো অবশিষ্ট জংলা-জলায় হরিণ কিংবা কুমিরের খোঁজে, কেউ বা শুধুই বনভোজন বা চড়ুইভাতি করতে। আর তাছাড়া বছরে একবার করে হয় মৎস্য মহোৎসব, এদের ভাষায় 'শ্রিম্প ফেস্টিভ্যাল'। পুরনো আচাফালায়া নদীর জলে নৌকো ও আশ্চর্য সব জলযানের বিচিত্র শোভাযাত্রায় মুখরিত হয়ে ওঠে মেকসিকো উপসাগরের এই প্রাচীন উপকূল মৎস্য মহোৎসবের অপরাহ্নে।

চার

শীতের এক সকালবেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আগের দিন রাতে, বেশ অনেক রাতে আমি নিউ অর্লিন্স এসে পৌঁছেছি। এসেছি বাটাভিয়া থেকে, বাটাভিয়া হলো নায়গ্রা হ্রদের কাছে একেবারে কানাডা সীমান্তে, সেখানে এখন আদিগন্ত তুষারাচ্ছন্ন। এ বছর শীতের ঝড় খুব দুর্দান্ত ছিলো উত্তর আমেরিকায়। বাটাভিয়া যাওয়ার

মতো আবহাওয়া ছিলো না, তবু গিয়েছিলাম পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আমার ছোটবেলার বন্ধু মইতুল বাটাভিয়ায় ডাকতারি করে, তার সঙ্গে দেখা হয়নি দীর্ঘ দুই দশক। মইতুলের দোতলার ঘরের জানলার কাঁচ পর্যন্ত উঠে এসেছে বরফের স্তূপ হাওয়ায় তুলোর মতো উড়ে উড়ে পড়ছে ছেঁড়া বরফ।

বাটাভিয়া থেকে নিউ অরলিন্স অনেক দূর। সেখানে যে ঘরে ছিলাম, সেটা আটতলায় জীবনে এত উঁচুতে আর কখনো রাত্রিবাস করিনি।

সদ্য ভোর হয়েছে। বিছানায় শুয়ে ঘুম-চোখে কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বৃষ্টির জলে ভেজা বাড়ি, ভেজা রাস্তা। এখনো রাস্তায় লোকজন চলাচল বিশেষ শুরু হয়নি, জানলার নিচের ছোট গলি গিয়ে পড়েছে দূরে বড়ো রাস্তায় সব পথ একটু পুরনো বাড়িঘর, কোলাপসিবল গেট লাগানো তালাবন্ধ দোকান টিনের সাইন-বোর্ড দু-চারজন মানুষ রেনকোট পরে কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। একটু যেন কলকাতার মতো।

দুপুর নাগাদ বুকটা হুহু করে উঠলো। মধ্যে একবার হালকা বৃষ্টিতে অল্প ভিজে রাস্তায় পাক দিয়ে এসেছিলাম। হোটেলের ঘরে ফিরে এসে আমার সহযাত্রীর খোঁজ করলাম, গতকাল রাতে তিনি বলেছিলেন, এই অঞ্চলটা তাঁর অল্পবিস্তর চেনা। তখন কথাটাকে খুব গুরুত্ব দিইনি। আজ দুপুরবেলায় ঝোড়ো-বাদল হাওয়ায় শীতের আবছা নীল পরিবেশে মনে হলো নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও কোনো এক পুরনো আমলের গ্রাম আছে সেখানে বাঁশবনের মধ্যে, খোঁড়া কুঁড়েঘরে বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন ধরে অবিরল। যদিও আমি জানি সেই সনাতন জগৎ এখান থেকে অনেক দূরে, কি অন্য এক ভূমণ্ডলে, তবু হলো এই ইস্পাত কংক্রীটের মহাদেশে কোথাও কি সেই গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরে আমি জেনেছিলাম সারা আমেরিকাতে গ্রীনিচ ভিলেজ ছাড়া কোনো গ্রাম নেই, সুপার বাজার ছাড়া কোনো বাজার নেই। কিন্তু

কোথাও গ্রামের মতো কিছু তো একটা থাকবে ?

আর বাজার ? শাক, তরকারি, মাছ, মশলা, তেল-নুনের ছোট ছোট দোকানপাতি, সব মিলে গমগম করছে চারপাশ দূর থেকে বোঝা যায় একটা বাজার বা হাটের কাছে এসে গেছি, সে বাজার প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে আজ আর কোথাও নেই।

এখন শুধু চেন স্টোর আর ড্রাগ স্টার, সেখানে প্যাকেটের মাংস আর কৌটোয় ফলের রস। দামদর নেই, কথা, বার্তা নেই ইলেকট্রিক ক্যালকলেটারেহিসেবের রসিদ কেটে যাচ্ছেন সদা-হাস্যময়ী বিক্রয়-বালিকা।

॥ পাঁচ ॥

আমার সহযাত্রীকে খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বলেছিলেন এ অঞ্চলটা চেনেন, কাছাকাছি কতদূর গেলে একটা স্থানীয় গ্রাম দেখা যায় ? ভদ্রলোক বললেন, 'কেন ?' আমি বললাম, 'এ জায়গার আবহাওয়া কেমন একটু আমাদের দেশের মতো।'

সহযাত্রী চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, 'কাছাকাছি কোনো একটা গ্রামাঞ্চলে যদি যাওয়া যেতো, একটু মিলিয়ে দেখতাম আমার গ্রামের চেয়ে সেটা কত আলাদা, ভদ্রলোক একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'সে রকম গ্রাম আছে কিনা তা বলতে পারবো না, তবে যদি আচাফালায়ার দিকে যান সেখানে একটা পুরনো গ্রাম, গাছ-পালা হরিণ কুমির, কচুরিপানার ফুল সমেত রক্ষা করা হয়েছে। কাঁচা রাস্তা, কাঠের সাঁকো, এমন কি কয়েক দশক আগের সাজ-পোষাক বিছানা-বাসন শুদ্ধ কিছু প্রমাণ মূর্তি দিয়ে গ্রামটিকে ভরিয়ে রাখা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'কি বললেন, জায়গাটার নাম ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এখনকার নাম মর্গান সিটি। আগে স্থানীয় নাম ছিলো আচাফালায়া।'

আমি বললাম, 'এ শব্দটার মানে কি ?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'জায়গার পুরনো নামের আবার মানে হয় নাকি? মিসিসিপি মানে কি? ক্যালকাটা মানে কি?' একটু থেমে আবার বললেন, 'আচাফালায়া নামে কোনো বিশেষ স্থান এখন আর নেই তবে পুরো অঞ্চলটাকেই এখন আচাফালায়া এলাকা বলে, আর তাছাড়া আচাফালায়া নদী আছে। এই এলাকাটা এক সময় ছিলো পুরোপুরি জেলেদের বস্তি।' বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক একটু পরে বললেন 'একটা পুরনো গান আছে আচাফালায়াকে নিয়ে।' বলে একটু থেমে নিয়ে গুণগুণ করে গাইলেন,—

'আচাফালায়া,

সুন্দরীতমা, তুমি তোমার মতো থাকো।'

গানটার ভাষা ও সুর বড়ো স্মৃতিগন্ধময় বড়ো বেদনাতর। আমি অনুরোধ করলাম, 'আমাকে পুরো গানটা লিখে দিতে পারেন?'

ভদ্রলোক সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'আচাফালায়ার লোকেরা ভেবেছিলো এই পৃথিবীতে সব বদলিয়ে যাবে, শুধু তাদের আচাফালায়া বদলাবে না।'

॥ ছয় ॥

আমি যখন আচাফালায়ায় পৌঁছলাম, তখন সকাল সাড়ে দশটা বাজে। এটা ঠিক পরের দিনের কথা, আজ বৃষ্টি অনেক কম।

নিউ অরলিন্স থেকে মার্গান সিটি পৌঁছুতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে, অবশ্য সোজা পথে নব্বই নম্বর হাইওয়ে দিয়ে বাসে কিংবা গাড়িতে করে গেলে। মিসিসিপি নদীর উপরে ব্রিজ ধরে সোজা রাস্তা, ব্রিজের নাম হিউ পি লং ব্রিজ। আরেকটা পথ আছে সেটা একটু ঘোরা পথ, ফেরি ষ্টিমারে মিসিসিপি নদী পাড়ি দিয়ে আচেরি বলে একটা ফেরিঘাটে পৌঁছানো যায়। সেখান থেকে গাড়ি ধরে মর্গান সিটি।

নিউ অরলিন্স একেবারে মিসিসিপি নদীর কোলে বসানো মিসিসিপি উপত্যকার বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো শহর। মূলতঃ স্প্যানিশ ও ফরাসী

এই দুই জাতির দেশান্তরীরা এই উপকূলবর্তী নগরে বাসা বেঁধেছিলো। কলকাতার মতো ট্রামগাড়ি এখনো চলে এই শহরের রাস্তায়, বিদেশের অন্যান্য শহরের মতো ভিড় নেই নিউ অরলিন্সের যানবাহনে। নিউ অরলিন্স, একটু যেন খোলামেলা, হাল্কা খুশির ছুটির শহর। নিউ অরলিন্সের পুরনো ফরাসীপাড়া, চীনেপাড়া এখনো ছবির মতো সাজানো। ইংরাজি মাতৃভাষা নয় এমন অসংখ্য লোক এই শহরের বাসিন্দা, তার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বা বাদামি বর্ণের লোকও কম নয়।

এখানে নিউ অরলিন্সের কথা বেশি বলার দরকার নেই, কারণ আমরা যাচ্ছি মর্গান শহরে। বড় নদী মিসিসিপি ছেড়ে ছোট নদী আচাফালায়ার খোঁজে।

আচাফালায়ায় পৌঁছে অবশ্য বুঝেছিলাম, আচাফালায়ার যা চরিত্র, নিউ অরলিন্স-এরও তাই। এক বর্ধিষ্ণু নগর তার পুরনো, সরল মফঃস্বলের আত্মাকে বহু কষ্টে রক্ষা করতে চাইছে যেন।

মর্গান শহরে সাড়ে দশটায় পৌঁছলাম। বৃষ্টি হঠাৎ খুব জোরে এসেছে, সমুদ্রের দিক থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া চাবুকের মত তীব্র বেগে আছড়িয়ে পড়ছে। আমার সোয়েটারের উপরে কোট, কোটের উপরে ওভারকোট, মাফলার, টুপি কিন্তু রেনকোট বা কোনো ছাতা নেই। গাড়ি থেকে নেমে একটা ঢাকা বারান্দার নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। আরো দু একজন সেখানে দাঁড়িয়ে। তাদের কারোরই কিন্তু পোষাকে আমার মতো শীতবস্ত্রের বাহুল্য নেই, আসলে এ শীত তাদের গা-সওয়া। একবার তো আমার সাজপোষাক দেখে একজন প্রায় অচেনা ব্যকতি সকৌতুকে মন্তব্য করেছিলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে আলাস্কা থেকে আসছেন।'

একটু পরে বৃষ্টি সামান্য ধরে এলো। হাইওয়ের একপাশে জল, এক পাশে শহর। সাবধানে ব্যস্ত হাইওয়ে পার হয়ে শহরের মধ্যে ঢুকলাম। শহরে ঢুকতেই পথের পাশে বিরাট মাঠের মধ্যে বড়ো দোতলা বাড়ি, মর্গান সিটি মিউনিসিপ্যাল অডিটোরিয়াম। এখানেই টুরিস্ট ইনফরমেশন সেণ্টারের অফিস।

অডিটোরিয়ামটি এইটুকু ছোট শহরের পক্ষে বেশ বড়ো। অফিস ঘরে গিয়ে দেখা হলো মাইকেল হপকিনস্ নামে এক যুবকের সঙ্গে। শুনে অবাক হলাম, এই ছোট মর্গান শহরের পর্যন্ত একজন টুরিস্ট ডিরেকটর আছে এবং মাইকেল সাহেবই সেই ডিরেকটর? ডিরেকটর সাহেবের অফিসটি অবশ্য খুব বড়ো নয়, তিনি নিজে এবং তাঁর দুই সাহায্যকারিণী।

তবে মাইকেল সাহেব খুব কর্ম ব্যস্ত, চটপটে লোক। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেই জানলাম যে, আমি আপনাদের 'সোয়াম্প গার্ডেন' দেখতে এসেছি, পুরনো আচাফালায়ার গ্রাম, তিনি প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কোথা থেকে এসেছি, কোথা থেকে আসছি। কবে এসেছি, কেমন লাগছে, আচাফালায়ার কথা কোথায় জানলাম ইত্যাদি এগারো-বারোটি প্রশ্ন করলেন তিনি। তাঁর প্রশ্নের জবাব ধীরে ধীরে গুছিয়ে দেওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচাফালায়ায় আমিই কি প্রথম ভারতীয়? আপনার কি মনে হয়?'

প্রশ্ন শুনে মাইকেল একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'না অন্ততঃ, একজন সিং এবং একজন প্যাটেল কাছাকাছিই আছেন, তবে প্রথম একশো জনের মধ্যেই আপনি পড়বেন।'

আমার একটু দুঃখ হলো, একটু নিরাশও যেন হলাম।

তা যাক, কিন্তু আমি আশা করিনি আচাফালায়ার মতো দূরতম জায়গায় কোনো ভারতীয় এসে বসবাস করবে। আমিই প্রথম, এই দাবি করার সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হলাম।

॥ সাত ॥

মাইক্রেল হপকিন্স খুবই আলাপি লোক। তিনি শুধু মর্গান শহরের টুরিষ্ট ডিরেক্টরই নন, এখানকার এই মিউনিসিপ্যাল অডিট-রিয়ামের ম্যানেজার, বড়বাবু সব কিছু।

মেম সাহেবদের বয়েস বোঝা কঠিন একথা সবাই জানে, কিন্তু সাহেবদের বয়েস অনুমান করাও সোজা কাজ নয়। চল্লিশ বেয়াল্লিশ

দেখে যাকে সমবয়সী বলে ভেবেছি পরে জেনেছি তার বয়েস পয়ষট্টি আর হোটেলের লবিতে যে ষাট বছরের গম্ভীর প্রৌঢ় আমাকে নিউ-ইয়র্কে বিদেশীদের কি কি বিপদ হতে পারে তার ফিরিস্তি দিয়েছিলেন তার বয়েস মাত্র চৌত্রিশ।

তবে মাইকেল সাহেবের বয়েস যে চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভদ্রলোক নববিবাহিত, বললেন তাঁর স্ত্রী পাশেই স্থানীয় ব্যাংকে কাজ করেন, আমি যদি ওদের সঙ্গে আজ দুপুরে খাবার খাই ওরা বিশেষ বাধিত হবেন। তা ছাড়া পাশেই যে রেস্টুরেন্ট রয়েছে, সামুদ্রিক খাদ্যের জন্যে সেটি নাকি অতি বিখ্যাত।

সামুদ্রিক খাদ্য মানে শামুক ভাজা, গুগলি সেদ্ধ, শ্যাওলার চচ্চড়ি ইত্যাদি। 'সুতরাং সামুদ্রিক খাদ্যের নাম শুনে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

মাইকেল সাহেবের প্রস্তাবে রাজি কিংবা অরাজি কিছুই বললাম না। প্রস্তাবটি সামান্য এড়িয়ে গিয়ে বললাম, সেতো অনেক দেরি আছে, চলুন আগে সোয়াম্প গার্ডেন দেখে আসি।'

মাইকেল ঘাড় নেড়ে বললেন, না তা নয়। আপনার টাইমসিট আমি তৈরি করে ফেলেছি। দাঁড়ান।' এই বলে বাঁদিকে হেলে একটু চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'লায়লা।'

শ্রীমতী লায়লা যথেষ্ঠ সুন্দরী না হলেও তন্বী, শুভ্রা, হাস্যময়ী, বয়েস একুশ থেকে একচল্লিশের মধ্যে, ইনি টুরিস্ট ডিরেক্টরের অন্যতমা সহকর্মিণী। তিনি এতক্ষণ দেড়গজ দূরে একটা চেয়ারে বসে গালে হাত রেখে একদৃষ্টিতে বিনা সংকোচে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

লায়লা জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনীর নাম হওয়া উচিত কিনা, লায়লা নাম্নী জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনীর আমার দিকে এ-রকম অপাঙ্গে তাকিয়ে থাকা উচিত কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে শ্রীমতী লায়লা স্মিত মুখে আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং জানতে চাইলেন তাঁর এক কাকা সিংহলে চা বাগানে কাজ করতেন, কোনো একজন স্মিথ, তাঁকে আমি চিনতাম কিনা?

যদিও জন নামটি সাহেবদের মধ্যে ঘরে ঘরে ছড়ানো, দুঃখের বিষয় আমি একজন জন'কেও চিনিনা যে কিনা সাহেব। কিন্তু লায়লাদেবীকে আশাহত করতে ইচ্ছে হলো না, বললাম, 'ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে জন স্মিথ নামটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।' লায়লাদেবী বললেন, সে কথা ঠিক। তাঁর জনকাকা খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন, সারা জীবনে সহস্রধিক শেয়াল মেরেছিলেন, এবং এর মধ্যে ফক্স, জ্যাকেল এবং ওয়াইল্ড ডগ সব রকমই ছিলো।

মাইকেল সাহেব লায়লাদেবীকে বললেন, মিস্ স্মিথ, টাইম সিডিউল্ড করে ফেলুন। লিখুন:—

ট্রাপাডা রে ফ্রম ক্যালকাটা, ইণ্ডিয়া

ইলেভেন এ এম: ডিরেক্টর টুরিসমের সঙ্গে আলোচনা

টুয়েলভ্ নুন: মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ওয়ান পি এম: লাঞ্চ

টু পি এম: ভিজিট টু সোয়াম্প গর্ডেন

লায়লাদেবী তথা মিস্ স্মিথ চটপট কাগজ পেন্সিলে টুকে নিয়ে দূরস্থ টাইপ রাইটারের দিকে দ্রুত চলে গেলেন।

এবার মাইকেল সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'বিকেলের প্রোগ্রাম পরে করা যাবে। বারোটা প্রায় বাজে, চলুন এবার মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়ে মেয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করা যাক।'

॥ আট ॥

মর্গান সিটির মেয়র হলেন মিস্টার ব্রাউনেল। এখানকার বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ব্রাউনেল স্মৃতি স্তম্ভ এই মেয়র সাহেবেরই পরিবারের নামে।

মিউনিসিপ্যাল অফিসে যাওয়ার পথে, মেয়র মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে যেতে হলো ব্রাউনেল স্মৃতি স্তম্ভ দেখতে। মাইকেল হপকিন্স বুদ্ধিমান লোক, কারণ মেয়রের কাছে নিয়ে যাওয়া মাত্র শুভ সম্ভাষণ বিনিময়, পরিচয় ইত্যাদি সাঙ্গ হওয়ার পরক্ষণেই ব্রাউনেল

সাহেব মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে ব্রাউনেল টাওয়ার দেখানো হয়েছে কিনা? বুঝতে পারলাম এটা ওঁর ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক দুর্বলতা।

মর্গান শহরের একপাশে পালুর্দ লেক। পালুর্দ লেক একটি চমৎকার সরোবর, এর জলে সারা গ্রীষ্ম ও বসন্ত কাল জুড়ে ওয়াটার স্কি'র সমারোহ চলে, দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এই হ্রদে নানারকম জলক্রীড়া করতে আসে। পালুর্দের তীরভূমি অসংখ্য ছোটবড় সাইপ্রেস গাছের ছায়ায় ঢাকা।

আমি তো গিয়েছিলাম শীতের এক অলস মধ্যাহ্নবেলায়, যখন আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, উপসাগরের দিক থেকে হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে পালুর্দের জলে ঢেউ তুলে। শীতের মেঘলা আকাশের নিচে পালুর্দের ঠাণ্ডা কালো জল, ওপারের গাছ-গাছালির সবুজ সমারোহ, কোথায় একটা পাখি ডাকছে—অনেক দিন আগে, অন্য এক ভূমণ্ডলে এই রকম অন্য একটা পাখির বৃষ্টি ভেজা কান্না; হঠাৎ একটা ছোটো ডিঙি নৌকো সাদা পাল তুলে হাওয়া ও ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত ভেসে যেতে যেতে আমাকে হাত তুলে চেঁচিয়ে কি বললো। পালের ঠিক নিচে হলুদ কার্ডিগ্যান, লাল টুপি পরা যে মেয়েটি বসে আছে মেঘলা ছায়ায় তার মুখের রেখা ঠিক স্পষ্ট নয়, আর তার বন্ধু কিংবা প্রেমিক কিংবা স্বামী কিংবা কেউ নয়, এই ঠাণ্ডার দিনে হাফ-প্যান্ট আর হাতকাটা সোয়েটার পরে যে হাল ধরে বসে আছে—দু'জনেই হাত নেড়ে আমাকে ডাকতে লাগলো তাদের নৌকোয়. যে নৌকোয় উঠতে গেলে এই গরম জামা-কাপড়, জুতো-মোজার সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা জলে অন্ততঃ দেড়শো গজ আমাকে সাঁতরিয়ে যেতে হবে।

মাইকেল হপকিন্স আমাকে জলার ধারে তাঁর গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে-ছিলেন, কোনো কিছুর খোঁজ-খবর করতে, খুব সম্ভব কাছাকাছি কোথাও পালুর্দের এই সরোবরের কোনো চৌকিদার বা কেয়ার-টেকার আছে, কার সঙ্গে কথাবার্তার

আওয়াজ শুনছিলাম। এইবার মাইকেল ফিরে এলেন, এসে যেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, একে কাজের দিন, উইক-এণ্ড বা রবিবার নয়, তার উপরে এই পচা বৃষ্টি, শীত। জানেন বসন্তকালে এখানকার, ভিড় সামলানো এক দায় হয়ে দাঁড়ায়।

মাইকেল সাহেবকে বললাম, আপনি বললেন, ব্রাউনেল মেমোরিয়াল টাওয়ারে নিয়ে যাবেন, নিয়ে এলেন লেকের ধারে। এখানে টাওয়ার কোথায়? তারপর একটু থেমে সকৌতুকে হেসে বললাম, আপনার টাইম-সিডিউল অনুযায়ী ঠিক মধ্যাহ্ন কালে বারোটার সময় আপনার মেয়র মহোদয়ের, সঙ্গে সাক্ষাৎ। এখন এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ হয়ে গেলো।

মাইকেল বললেন, আমরা টাওয়ারের খুব কাছে এসে গেছি। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন।'

একটু এগোতেই ব্রাউনেল মেমোরিয়াল টাওয়ার চোখে পড়লো। সাদা, উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ। অনেকটা মনুমেণ্টের মতো তবে আমাদের ময়দানের শহীদ মিনারের চেয়ে উঁচু নয় কিন্তু আয়তনে বেশ চওড়া। মাইকেল সাহেব জানালেন উচ্চতা একশো ছয় ফুট। টাওয়ারের চুড়ায় বেশ বড়ো একটা ঘরের মতো বেশ চওড়া, প্রায় পনেরো ফুট উঁচু কয়েকটি জালনা ঘরটির চারপাশে। ঘরটির ছাদে সুন্দর কার্ণিশ ব্রাউনেল টাওয়ারের চারপাশের বাগানটি বিশাল দশ একরের বেশি জমি হবে।

ব্রাউনেল টাওয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই স্তম্ভটি নয়, স্তম্ভটির ভিতরে বসানো যন্ত্রচালিত ঘণ্টা। সবশুদ্ধ এক ষট্টিটি ঘণ্টা আছে, যাতে সব রকম বাজনার সুর তোলা যায়, সুন্দর করে সুরবাঁধা আছে এই যন্ত্রটিতে, চমৎকার পালিশ, ঝকঝক করছে। মেয়র ব্রাউনেল সাহেব তাঁর পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে এই ঘণ্টা যন্ত্রটি উপহার দিয়েছেন, এটি তৈরী করে আনা হয়েছে হল্যাণ্ডের একটি শতাব্দী-প্রাচীন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে।

লেক পালুর্দ এবং ব্রাউনেল স্তম্ভের পাশ থেকে ফিরে মেয়রের অফি-

সের দিকে যেতে যেতে মাইকেল হপ-কিন্স বললেন, এই পালুর্দ হ্রদের পাশেই সাইপ্রেসের জঙ্গলে এই প্রাচীন আচা-ফালায়ার জলাভূমির পরিবেশেই পৃথিবীর প্রথম টার্জান ছবির শুটিং হয়ে-ছিলো, সিনেমা তৈরির সেই আদিম যুগে ষাট বছর আগে। সেই ছবিতে আচাফলায়ার জলা-জঙ্গলে টার্জানকে এমন মানিয়ে গিয়েছিলো যে আচাফালায়াকে টার্জানের জন্মভূমি বললে বেশি বলা হবে না। তারপরে বার বার বহুবার টার্জান সিনেমার বহু সংস্করণ পৃথিবীর বহু প্রান্তে রচনা হয়েছে কিন্তু আচাফালায়া নদী তীরবর্তী এই পালুর্দ হ্রদের বন্য জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর কোথাও নাকি পাওয়া যায়নি।

এবার আমার মনে পড়লো অতি দূর শৈশবে টার্জানের সেই আদিম যে সংস্করণ সিনেমা আমিও দেখেছি কিন্তু তার স্মৃতি আজ সম্পূর্ণ ঝাপসা ও অস্পষ্ট, সেই সূত্র ধরে আজ এই পালুর্দ হ্রদের তীরে সাইপ্রেসের জঙ্গল মেলানোর চেষ্টা করা হাস্যকর হবে।

এডগার রাইস বরোস টার্জানের গল্প লিখেছিলেন ১৯১২ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগের সেই নিস্তরঙ্গ উত্তেজনাহীন পৃথিবীর সরলমতি পাঠকদের জন্যে রচিত বন্যতা ও বীরত্বের কাহিনী অনেকদিন পার হয়ে আজো আন্দোলিত করে। এর ঠিক পাঁচ বছর পরে ১৯১৭ সালে প্রথম টার্জানের ছবির শুটিং হল এবং সার্কাস পার্টির লৌহমানব এলমো লিংকনকে নিয়ে টার্জান সিনেমা তোলা হলো আচাফালয়ার সাইপ্রেস জলা ভূমিতে। তারপর অন্ততঃ পঞ্চাশটি টার্জানের সিনেমা হয়েছে, এমন কি এই ভারতবর্ষে হিন্দিতে পর্যন্ত দুটি—সব শুদ্ধ এখন পর্যন্ত নাকি দুশো কোটি লোক টার্জানের সিনেমা দেখেছে—এর শুরু হয়েছিল আচাফালায়।

॥ নয় ॥

মেয়র ব্রাউনেলের অফিসটি একটা পুরোন ধাঁচের বাড়ি। একতলায় ঢুকেই ডানদিকে একটা মাঝারি আয়তনের ঘরে মেয়র বসেন। ঘরটিতে মেয়র ছাড়াও আর দুই ভদ্রলোক এবং মহিলা রয়েছেন।

আমি যখন মাইকেল হপকিন্সের সঙ্গে মেয়র ব্রাউনেলের ঘরে ঢুকলাম, তখন তিনি মনোযোগ দিয়ে সামুদ্রিক বেতার বার্তা শুনছেন। অন্যান্য উপ-কূলবর্তী শহরের মেয়রের মতই মর্গান সিটির মেয়েরের নিকটবর্তী সমুদ্রাঞ্চলের নৌকো ও জাহাজগুলির আবহাওয়া সংক্রান্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে যেহেতু ঝোড়ো মেঘলা দিন মেকসিকো উপসাগরে এবং সন্নিহিত আচাফালায় অববাহিকার নদী ও খালে বেশ বিপজ্জনক তাছাড়া বৃষ্টি ও কুয়াশায় দৃশ্য-যানতা ইংরেজিতে যাকে ভিজিবিলিটি বলে, অতি অস্পষ্ট তাই মেয়র মহোদয়কে একটু যেন চিন্তিত মনে হলো। তবে এটাও বললেন যে তাঁর এই এলা-কায় এটা খুবই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং আবহাওয়ার অবস্থা তেমন কিছু গুরুতর নয়।

মেয়র সাহেব আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যথেষ্টই খুশি হয়েছেন বলে বোধ হলো।

মেয়র ব্রাউনেলের বয়েস প্রায় ষাট হবে। শকত, সমর্থ পেটা চেহারা। পেশীবহুল স্বাস্থ্য কোথাও এক ইঞ্চি চর্বির আধিক্য নেই। চলন-বলনও খুব চটপটে, নিজের শিকারের গল্প বললেন, সমুদ্রে স্পিটবোট চালান, মাছ ধরতে যান। বাড়িতে উঠোনে কুমির পুষেছেন সরল প্রকৃতির পরিশ্রমী, আত্মসচেতন লোক।

অবহেলিত, পশ্চাৎগামী জলা-ভূমির গ্রাম যে মর্গান সিটিতে পরিণত হয়েছে, তার পিছনে তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের লোকদের যে অবদান রয়েছে ব্রাউনেল সাহেব তা আমাকে বললেন।

আমি যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্রাউনেল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন তারপরে আমাকে কিংবা মাইকেলকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সোজাসুজি মাইকেলকে আদেশ করলেন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে আমার বাড়িতে দশ মিনিটের মধ্যে চলে এসো, আমি যাচ্ছি। বলে হুস করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মাইকেলের মুখটা কেমন শুকিয়ে গেলো। সোয়া বারোটা বাজে, একটার সময় তাঁর স্ত্রীর ব্যাংকের লাঞ্চ টাইম। বোধ হয় ইতিমধ্যে

কোনো এক সুযোগে সহধর্মিণীকে তিনি জানিয়েও দিয়েছেন যে আমার মত একজন ভোজন সঙ্গী তিনি আজ সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

ব্যাপারটা অনুধাবন করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হলো না। আমি মাইকেলকে বললাম, কোনো চিন্তা করবেন না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক একটার সময় লাঞ্চ করবো। চলুন এর মধ্যে মেয়র বাহাদুরকে কাটিয়ে আনা যাক।

মাইকেলের মুখ দেখে মনে হলো না তিনি খুব আশ্বস্ত বোধ করলেন। তবু তাঁকে সাহস দিয়ে বললাম, কোনো চিন্তা করবেন না। আমার কলকাতিয়া বুদ্ধির উপর কিঞ্চিৎ আস্থা রাখুন।

ব্রাউনেল সাহেবের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে বারোটা আমাদের হাতে মিনিট কুড়ি সময়। বারোটা পঞ্চাশ নগাদ উঠতে পারলে মোটামুটি একটার সময় শ্রীমতী মাইকেল হফকিন্সের লাঞ্চ এ্যাপয়েন্টমেণ্ট শ্রীযুক্ত মাইকেল হপকিন্স রক্ষা করতে পারবেন।

সুন্দর বাড়ি ব্রাউনেল সাহেবের। বাড়ির মধ্যে বিশাল প্যাসেজে একটা সুন্দর যন্ত্র ও চাকা লাগানো নৌকো। এই নৌকোগুলিকে জল থেকে সোজা চালিয়ে ডাঙ্গায় তুলে আনা যায়। নৌকোটির গায়ে রাজহাঁসের মতো ধবধবে সাদা রঙ, চমৎকার গদি আঁটা চেয়ার, উঁচু ছাদ, পাটাতনে কার্পেট বিছানো, নৌকোয় উঠবার সিঁড়ির রেলিংটি পর্যন্ত এমন যে দেখলেই মনে হয় বেয়ে উঠি।

আসলে মিস্টার ব্রাউনেল বিত্তবান সৌখীন মানুষ তার সঙ্গে আছে তাঁর বনেদিয়ানা যা এদেশে কিঞ্চিৎ দুর্লভ। এদেশের অধিকাংশ বাড়িঘর ফ্ল্যাটই এত সাজানো গোছানো, এতো হালকা যে মনে হয় ডেকরেট'রের তৈরি প্যাণ্ডেল। মাত্র দু-চারদিনের জন্যে। সে জায়গায় ব্রাউনেল নিবাস রীতিমত পাকা-পোকত স্থায়ী বাসস্থান, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে পুরুষানুক্রমে বাসের জন্যে তৈরি করা হয়েছে।

এ বাড়িতে দ্রষ্টব্য বিষয় দুটি। এক নম্বর হলো পোষা কুমির। প্যাসেজ পেরিয়ে বাড়ির অন্দর মহলের উঠোনের মধ্যে একটা চৌবাচ্চা তৈরি করে তাতে সেটা রাখা হয়েছে। বাড়িতে পৌঁছাতেই সস্ত্রীক

মেয়র সাহেব দোরগোড়ায় এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রথমেই উঠোনে কুমির দেখাতে নিয়ে গেলেন। কুমিরটি এখনো নাবালক, তবে মেছো কুমির বা জাঁতি কুমির নয়, একেবারে জাতকুমির বা এ্যালিগেটর, আচাফালায়ার আসল জীব। আচাফালায়া নদীর এক খাঁড়ির মধ্যে গত শীতে কুমিরটি ধরেছিলেন ব্রাউনেল সাহেব।

কুমিরটি দেখতে আমাদের সময় বেশি লাগলো না।

এ বাড়ির দু নম্বর দ্রষ্টব্য হলো ড্রয়িংরুম। ব্রাউনেল দম্পতির সঙ্গে উঠোনের দিক থেকে পিছনের দরজা দিয়ে আমরা সরাসরি ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। খুব কম আলো জ্বলছে, আবছা অন্ধকার। একটু লম্বা সাইজের ঘর, তার দুই পাশে দুটো বিশাল ফায়ার প্লেসে কাঠের চুল্লি জ্বলছে, তার হলুদ আগুনের আভায় ঘরটি রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দূরে এক কোণে সেলার, নিচু থেকে কাঠের সিঁড়ি উঠে এসেছে, তার মধ্যে বিচিত্র দেশের এবং দীর্ঘকালের হাজার রকম পানীয়। গেলাস-ও নানা জাতের, পাতলা কাঁচের, মোটা কাঁচের কাটা কাঁচের, পাথরের, পোড়ামাটির, কাঠের, এমন কি বাঁশের। রূপোর এবং তামার গেলাসও আছে বলে মনে হলো। ঘরের মধ্যে চেয়ার ইজিচিয়ার, কাঠের, বেতের গদি ইতস্তত চারদিকে ছড়ানো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যকর হলো এই ঘরের দেয়াল। সারা ঘরের চার দেয়াল ধরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল নতুন ও পুরনো আমলের সব আগ্নেয়াস্ত্র ফাঁকে ফাঁকে দু একটা প্রস্তর খচিত ছুরি, কয়েক জোড়া তরবারি, একটি অতি দীর্ঘ বল্লম এবং একটি সুদৃশ্য ধনুক। এই ধনুকটি নাকি ব্রাউনেল সাহেবের পিতামহ সংগ্রহ করেছিলেন আচাফালায়ার শেষ আদিবাসী পরি-বারটির কাছ থেকে।

আমি মেয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার আদিবাসী পরিবার-গুলির শেষ পর্যন্ত কি হলো?' মেয়রের হয়ে মাইকেল জবাব দিলেন, 'হয় তারা এখান থেকে চলে গেলো অথবা তারা নবাগত ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশে গেলো। এখন আর তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না।'

আমি এই আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে মেয়র গৃহিণীকে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই কোনোদিন ভারতবর্ষে যান নি ?'

শ্রীমতী ব্রাউনেলের, ভারতবর্ষ সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতুহল যথেষ্টই এবং হয়তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে মধুর আলোচনাও তিনি কিছু করতেন কিন্তু তিনিই এ বাড়ির গৃহিণী এবং এই পরিচারক-পরিচারিকাহীন দেশে অতিথি অভ্যাগত এলে পুরো দায়িত্ব গৃহিণী মহোদয়ার।

তবে এখন মেয়র সাহেবের আতিথ্য আমি গ্রহণ করবো না কারণ শ্রীমতী মাইকেলের কাছে পৌছাতে হবে একটার মধ্যে। আমি মিসেস ব্রাউনেলকে বললাম, 'আমার জন্যে দয়া করে ব্যস্ত হবেন না। আমি বেশিক্ষণ বসবো না।' তার পরে একটু থেমে একটা সাদা মিথ্যা কথা বললাম, 'আমি শ্রীমতী মাইকেলকে কথা দিয়েছি, তাঁর সঙ্গে একটার সময় লাঞ্চ করবো।'

মেয়র ভদ্রলোক একটা কাঠের মই বেয়ে ছাদের দিকে উঁচুতে উঠে গিয়ে-ছিলেন একটা বিচিত্র পিস্তল নামিয়ে আনার জন্যে, সেটার ট্রিগার থেকে নল পর্যন্ত আগাগোড়া পুঁতির মতো কি যেন লাগানো, অল্প আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আমার কথা শুনে তিনি মই-এর উপরের ধাপে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি হলো আপনি আমাদের এখানে বসবেন না ?'

মাইকেল হপকিন্সের পক্ষে অবস্থাটি অতি অস্বস্তিকর, আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিয়ে প্রসঙ্গান্তরে অবতীর্ণ হলাম 'মিস্টার ব্রাউনেল, আপনার ভাববার ঘরটি সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম, মনে হয় যেন কোনো রহস্য কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি। আমার ছেলের জন্যে মায়া হচ্ছে, সে যদি আজ সঙ্গে থাকতো এই ঘরটি দেখে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়তো।'

হঠাৎ নাটকীয়ভাবে মই-এর উপর থেকে ঝলমলে পিস্তলটি হাতে নিয়ে মিস্টার ব্রাউনেল লাফিয়ে নামলেন, তারপর আমার দিকে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে বললেন, 'মাননীয় ভদ্রমহোদয়, ভবিষ্যতে যদি

কখনো আপনি আমার ঘরে আপনার ছেলেকে সঙ্গে না নিয়ে একা আসেন আপনাকে গুলি করে হত্যা করা হবে।'

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম। ব্রাউনেস নিবাস থেকে বেরিয়ে আসতে বাইরে ঘরের দেয়ালে দেখলাম গৃহস্বামীর একটি বড় আলোকচিত্র টাঙ্গানো, তার নিচে বড় বড় হরফে লেখা,

'আমি যে কিছু বুঝতে পারি না,

তা নয়,

আমাকে কেউ বোঝালেই

আমি বুঝতে পারি।'

॥ দশ ॥

আমরা ঠিক একটা বেজে পাঁচ মিনিটে ভোজনালয়ের দরজায় পৌঁছলাম। দরজার সামনেই শ্রীমতী মাইকেল হপকিন্স অপেক্ষা করছিলেন, হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'সব টেবিল ভর্তি হয়ে গেছে একটু বোধহয় দাঁড়াতে হবে।'

শ্রীমতী মাইকেল তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, সুহাসিনী যথারীতি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্বামী, শ্রীমতী মাইকেল বললেন, কয়েকদিন আগে এক দম্পতি কাবুল না বার্মা থেকে এসেছিলেন, তাঁদের খুব ভালো লেগেছিলো তাঁর।

কাবুলের আর বার্মার লোকদের চেহারায় যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, দুই-এর মধ্যে কোনো ভুল বা সংশয় হওয়া যে অসম্ভব, সে প্রশ্নটা আমি তোলার আগেই মাইকেল বললেন, 'আরে না না, ওঁরা এসেছিলেন ইরাণ থেকে।'

কথা বলতে বলতে আমরা রেস্টুরেন্টের ভেতরে প্রবেশ করেছি।

বেশ বড়ো হলঘর। অন্ততঃ একশো-দেড়শো জন একসঙ্গে বসে খাচ্ছে। আমাদের দেশের কোনো মফঃস্বল শহরে এরকম দৃশ্য অসম্ভব, এমন কি কলকাতা বা বোম্বে শহরেও শতাধিক লোক একসঙ্গে এক হোটেলের হলে দুপুরবেলায় খাচ্ছে এও প্রায় দেখা যায় না।

আসলে এরা দুপুর-বেলার খাওয়াটা বাইরেই খায়।

একটা টেবিল ফাঁকা হতেই আমরা প্রায় ছুটে গিয়ে বসলাম। কিন্তু তারপর আর বেয়ারা আসে না, মাইকেল উঠে গিয়ে একজনকে ধরে আনলেন, তিনি ফিরে গিয়ে একজন মহিলা সেবিকাকে পাঠিয়ে দিলেন, মহিলা সেবিকা আমাদের টেবিল পর্যন্ত এসে আমাকে বিশেষ-ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'আমাদের কোনো নিরামিষ খাবার নেই তবে কিছু কুকি (মিষ্টি গন্ধময় বিস্কুট) এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (আলু ভাজা) হতে পারে।' এই বদান্য ভদ্রমহিলা হয়তো আমার শ্যামবর্ণ দেখে অথবা আমার মুখশ্রী দেখে কি করে ধরলেন যে এই লোকটা মাছ-মাংস আমিষ খায় না সে প্রশ্ন না তুলে আমি বললাম, 'আমি আমিষই খাবো, তবে আপনাদের ঐ সামুদ্রিক খাদ্য নয়।'

ভদ্রমহিলা ফিরে গিয়ে একটা খাদ্যতালিকা নিয়ে এলেন।

আমি মর্গান সিটির টুরিষ্ট ডিরেক্টরের বিশেষ অতিথি। খাদ্যতালিকা হাতে নিয়ে মাছের এলাকায় তাকালাম, একটা খাবারের নাম রয়েছে ক্যাচ অফ দি ডে। আমি শ্রীমতী মাইকেলকে আঙুল দিয়ে ঐ জায়গাটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ জিনিষটা কি? শ্রীমতী মাইকেল বুঝিয়ে বললেন, সমুদ্রের কাছাকাছি রেস্টুরেণ্টগুলিতে এই জাতীয় আইটেম থাকে, খাবারটা হলো সেদিন জালে যে মাছ উঠেছে সেই মাছ-ভাজা। এই বলে শ্রীমতী মাইকেল ওয়েট্রেসকে ডেকে জানতে চাইলেন আজ কি মাছ উঠেছে। ওয়েট্রেস যে মাছের নাম বললেন সে নাম আমি জন্মেশুনিনি। শ্রীমতী মাইকেলও ভুরু কুঁচকে ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি সমুদ্রের মাছ? ওয়েট্রেস তাড়াতাড়ি বললেন, না না এট. সমুদ্রের মাছ নয়। আজকের এই ঝড়-জলে সমুদ্রের মাছ কোথায়? এটা আচাফালায়া নদীর ফসল। শুনে আমার উৎসাহ বাড়লো, আচাফালায় এসে আচাফালায়া নদীর মাছ খাবো। এর চেয়ে কি আর বেশি আশা করি, আমি বললাম, 'এই মাছই আমার চাই।'

ভদ্রতার খাতিরেই বোধহয় মাইকেল দম্পতিও নিজেদের জন্যে ঐ একই অর্ডার দিলেন। 'ক্যাচ অফ দি ডে'র সঙ্গে এলো এক হাতা

পরিমাণ একটু অতিরিক্ত সেদ্ধ স্বাদ-গন্ধহীন সাদা ধবধবে ভাত, কিছু আলু ভাজা, ফেনিল মিষ্টি জাতীয় একটা দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে কফি। আমি একটা মজার জিনিস আমেরিকায় লক্ষ্য করেছি। ঠাণ্ডা বরফ জলের সঙ্গে গরম কফি এখানকার লোকেরা প্রায় একসঙ্গে পান করে। পরিষ্কার সাদা জল চট করে পাওয়া যায় না, বাইরে বরফ পড়ছে, রক্ত জমানো ঠাণ্ডা, তার মধ্যে লোকের ঘরে বসে জল কিংবা অন্য পানীয় বরফ দিয়ে খাচ্ছে এদৃশ্য আমেরিকায় অতি সাধারণ।

আহার করতে করতে মাইকেল দম্পতির সঙ্গে গল্প হলো। এঁরা দুজনেই এই অঞ্চলেই বড় হয়েছেন। চারদিকে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছড়ানো। আমাদের খাওয়ার টেবিলেই কতজন এসে 'হ্যালো' কিংবা 'হাই' করে গেলো। অন্তত তিন-চারবার আমাকে উঠতে হলো দাঁড়িয়ে করমর্দন করার জন্যে এবং শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে।

শ্রীমতী মাইকেলের নিজের নামটা ভুলে গেছি। তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু তাঁকে অনেকদিন মনে থাকবে। তিনি শুধু সুহাসিনী নন, সুভাষিণীও, তাছাড়া সত্যিই বুদ্ধিমতী এবং সহৃদয়া। আমাকে বললেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে সোয়াম্প গার্ডেন যাচ্ছেন, ভালো কথা কিন্তু সাবধান। গার্ডেনে কুমির আছে, ক্ষুধার্ত কুমির, তা ছাড়া কুমিরদের খাবারও অনেক দিন দেয়া হয়নি। আর জানেন তো আমার স্বামী শুধু এখানকার টুরিষ্ট ডিরেকটর নন, তিনি তদুপরি এখানকার পাবলিসিটি ম্যানেজার, আচাফালায়া-অন্ত প্রাণ ওঁর। যদি একজন বিদেশীকে আচাফালায় জলাবাগানে কুমির খেয়ে ফেলে কতবড় পাবলিসিটি হবে ভেবে দেখুন।'

আমি হেসে বললাম, 'আমাকে কুমিরের ভয় দেখাবেন না, আমি কুমিরের দেশের লোক। আমি যেখানে জন্মেছি সেখানকার নদীতে খালে কুমির কিলবিল,' তারপর কি মনে পড়ায় দেশী ছড়াটা সাদা বাংলায় আবৃত্তি করে বললাম,

'ভালো কথা মনে পড়লো আচাইতে

আচাইতে,

ঠাকুরঝিরে নিয়া গেলো নাচাইতে

নাচাইতে।'

শ্রীমতী মাইকেল অবাক হয়ে বললেন, 'এর মানে কি ?'

বললাম, 'এ অনেক দূরের একজনের দেশের খুব দুঃখের কিংবা বোধহয় খুব মজার একটা গল্পের ভূমিকা মাত্র।'

॥ এগারো ॥

শ্রীযুক্ত মাইকেল হপকিন্স আমাকে নিয়ে সোয়াম্প গার্ডেনে এসে পৌঁছালেন। এই বৃষ্টি-বাদল ঠাণ্ডার দিনে এখানেও আমি একাই দর্শক আজ। মাইকেল সাহেব নিজের হাতে গেট খুললেন, একটু এগিয়ে একটা দিশি চেহারার কাঠের ঘর, তার পাশ দিয়ে আমরা খালের ওপরে কাঠের সাঁকো পার হয়ে সংরক্ষিত জলাবাগানের ভিতরে ঢুকলাম।

বড়ো বড়ো সাইপ্রেস গাছেব গায়ে সুইচ লাগানো। সুইচের সঙ্গে রেকর্ড ও এ্যামপ্লিফায়ারের যোগ রয়েছে। মাইকেল সাহেব সুইচ টিপে দিতেই এামপ্লিফায়ার বেজে উঠলো :—

এদিকে শীতের দিন এসে গেলো,

তুমি ক্রমশঃ

শুনতে পাচ্ছো,···

সত্যি সত্যি কাছাকাছি কোথায় যেন বুনো হাঁসের ডাক শোনা গেলো, সেটাও কি রেকর্ড ?

মাইকেল এগিয়ে গিয়ে আরেকটা গাছের সুইচ চালিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক দুটো ছাতা এবার হাতে করে নিয়ে এসেছেন, একটা তাঁর জন্যে, একটা আমার জন্যে। ছাতামাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে গাছের ছায়ায় প্রাচীন গ্রামের জনপথে আমরা ভেজা পাতার ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, আমাদের পথের পাশে পাশে একেকটি দ্রষ্টব্যকে ঘিরে

তখন স্পীকার বেজে চলেছে :—

স্বাগতম ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আমাদের সোয়াম্প গার্ডেনে স্বাগত। আমি আমাদের বলছি কারণ এই সোয়াম্প-গার্ডেন আমাদের, আমার- আপনার সকলের, প্রত্যেকের, সত্যি সত্যি আমাদের। এই জলাভূমি রক্ষা ক'রে রাখা হয়েছে আচাফলায়ার পুরনো দিন আর তার আশ্চর্য মানুষগুলিকে মনে রাখার জন্যে।...

এতো চাপা এবং এতো গভীর এই অরণ্যভূমি, অন্ধকারে বিশাল বিশাল ভৌতিক গাছগুলি তার ডালে ধূসর প্রেতাত্মার মতো শ্যাওলা ঝুলছে, কি এক অনিবার্য হাতছানি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো জঙ্গল ও নদীর গভীরে আরো গভীরে গহ্বরে, অভ্যন্তরে। 'আমি সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠার পাইয়োনিয়ার, আমি সেই আগন্তুকে, অগ্রদূত, আমার ছবি যাদুঘরের দেয়ালে দেয়ালে এখন টাঙ্গানো 'আছে।

....ঐ দেখুন ঐ কুটির। ঐ কুটির কিন্তু আমি বানাইনি। ঐ কুটির আমি এখানে আসার আগেও ছিলো, অনেক দিন আগে থেকেই ছিলো। আমার-ও আগে আমারই মত দুঃসাহসী মানুষেরা, তারা ছিলো লাল মানুষ, তারা কোন্ প্রগৈতিহাসিক যুগে এখানে এসেছিল। খাঁড়ির ধারে ঝিনুকের জমাট ডাঙায় পাতা আর কাঠ দিয়ে এই কুটির তৈরি হয়েছিল। দেখুন ঐ কুটিরের দেয়ালে কি চমৎকার লতার কারুকাজ, দেখুন ঐ বেতের বাক্স। এই জলাভূমির অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ঐ প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা যে আভিজাত্য রচনা করেছিল, সভ্যতা এখন তার থেকে কত দূরে চলে যাচ্ছে।...

...এ সেই সময়ের কথা যখন আমার রাজার নাম ছিল সাইপ্রেস আর আমি ছিলাম লুইসানিয়র কাঠের সওদাগর। মাত্র পঞ্চাশ বছর ছিল মহান সাইপ্রেসের রাজত্ব, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি। এরই মধ্যে দলে দলে লোক এলো আমারই মতো দুঃসাহসী লোকেরা তাদের নাম দেয়া হলো সোয়াম্পার। সাপ, কুমির, পোকামাকড়, বন্যা ও ঝড়ের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম।

...আর আমাকেও দেখুন। আমি এই আচাফালার শেষ সম্রাট।

আমি শেষতম প্রাচীন সাইপ্রেস বৃক্ষ। চারপাশে যে সাইপ্রেস বৃক্ষমালা দেখছেন, ষাট-সত্তর বা আশি ফুট উঁচু তারা নেহাৎই শিশু, তাদের কারো বয়েস পঞ্চাশ বছরের বেশি নয়। আমার বয়েস ছয়শো বছর। যেদিন কলম্বাস আমেরিকায় এসে পৌঁছালো, সেদিনও আমি ছিলাম, তবে নিতান্ত এক চারা গাছ। আমার বংশের সবাই যখন নিহত হলো সোয়াম্পারদের কুঠার আর করাতের আঘাতে, আমি জানি না কি এক অজ্ঞাত কারণে আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম। তারপর আমি আজো বেঁচে আছি, চারপাশে অর্বাচীন সাইপ্রেস বৃক্ষমালা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বড়ো হচ্ছে। আমি আশা করি আরো অনেক দিন বেঁচে থাকবো।

…এই সেই নৌকো, জলাভূমির বিখ্যাত নৌকো, আর আমিই সেই নৌকোর মাঝি। এই নৌকোই আমার সংসার, আমার বাড়ি। সাইপ্রেস গাছের কাঠ দিয়ে বানিয়েছি, আমরা জলে-জলে ঘুরে বেড়াই তখনই প্রয়োজন হয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাই। এই নৌকায় আমাদের বাড়িঘর, আমাদের গৃহস্থালী। ঐ দেখুন আমার কেরোসিনের লণ্ঠন, ঐ আমাদের আলো দেয়, এ কাঠের উনুন ওতে রান্না হয়। সবই আমাদের নৌকোর মধ্যে।

…আমাকে দেখেই আপনি চিনতে পারছেন। আমার হাতে জাল, আমার ঝুড়িতে মাছ। আমি একজন সামান্য জেলে। কিন্তু বোধহয় খুব সামান্য নই, এই জলাভূমির অগ্রগতির ইতিহাসে আমার কথাও বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে। আর সত্যিই তো তাই ভেবে দেখুন নদী-নালার দেশে একজন জেলের অবদানই তো সবচেয়ে বেশি। ঠিক আছে, অহংকার করবো না কিন্তু আমার চমৎকার জালটিকে দেখুন. এ আমি নিজেই বুনেছি, বুনে আলকাতরা দিয়ে জালে রং মাখিয়ে নিয়েছি, যাতে শকত থাকে, ছিঁড়ে না যায়, আর জলের কালো রং-এর সঙ্গে মিশে যায় যাতে মাছেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়। গভীর সমুদ্র আর গহন নদী থেকে আমি মাছ ধরে আনতাম, বরফ ছিল না, গ্রীষ্মের দীর্ঘ-পথ, কত মাছ নষ্ট হয়ে যেতো। তবু আমি হাল ছাড়িনি।

আমি এক পরিশ্রমী যুগের সৈনিক, আমাকে সামান্য জেলে ভেবে তুচ্ছ করবেন না। আমি জীবন বিপন্ন করে সামান্য ডিঙি নৌকোয় চড়ে ঝড়ের উত্তাল সমুদ্র থেকে পাগল আচাফালায়ার জল থেকে মাছ তুলে এনেছি সভ্যতার আহার যোগাবার জন্যে, আমাকে অকারণে আমার জীবিকার জন্যে তুচ্ছ করবেন না, আমার বংশধরেরা আজও আপনাদের খাবারের টেবিলে তাদের পরিশ্রমের উপহার প্রতি দুপুরে প্রতি সন্ধ্যায় প্রেরণ করেছে।···

···'আপনি নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারছেন না। না, আমি কোনো প্রাগৈতিহাসিক মানব নই। আমি এই সেদিনও ছিলাম, এই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও। এই জলাভূমির সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতীক ঐ সাইপ্রেস গাছের ডালে ঝুলন্ত শ্যাওলা, যাকে বলা হয় স্প্যানিশ শ্যাওলা, ঐ শ্যাওলা সংগ্রহণ ছিল আমার জীবিকা। যারাই আচাফালায়ায় এসেছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ঐ শ্যাওলা। কারোর কাছে এই শ্যাওলা সৌন্দর্যের প্রতীক। কারোর কাছে বেদনা ও দুঃখের প্রতীক।

···'প্রিয় দর্শক, প্রিয় আগন্তুক। আমি জানি আপনি এখন এই আচাফালায়ার জলাভূমি থেকে ফিরে যাচ্ছেন। অনেক দূরে আপনার নিজের নগরে গিয়ে অল্প অল্প ছেঁড়া স্বপ্নের মতো পড়বে, এই নির্জন পুরনো গ্রামের কথা। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এলেও আপনি কি এত সহজে ফিরে যেতে পারতেন? সেই জীবনে নিশ্চয়তা ছিল না, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, ছিল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, ছিল রক্ত ও নোনাজল। তবু আপনি ফিরে যেতে পারতেন না। ফেরা সম্ভব ছিল না। মেকসিকো উপসাগর থেকে উত্তাল বাতাস এসে আপনার পথ রোধ করে দাঁড়াতে, সাইপ্রেসের অরণ্য আপনাকে গ্রাস করে নিতো, আচাফালায়া সুন্দরী আপনার হাত ধরে বলতো:

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।

প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব···

॥ বারো ॥

আমি অবশ্য ফিরে এসেছিলাম। একালে কেউ আর আচাফালায়ায় আটকিয়ে পড়ে না।

মাইকেল সাহেব আমাকে বিকেল—বিকেল ভ্যাচেরি নামে মিসিসিপি নদীর এক ফেরিঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন, ওপার থেকে নিউ অরলিন্স শহর দূরে নয়। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর স্টিমার ঘাটে এসে ভিড়লো। তারপর যখন ছাড়লো, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আকাশ একেবারে কালো। হাওয়া বইছে তুমুল বেগে একটু পরেই তীব্র বেগে বৃষ্টি এলো। মাঝারি আকারের স্টিমার প্রায় ফাঁকা। এক নির্জন কোণে এক প্রেমিকযুগল নিঃশব্দে হাত ধরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজছে। এপাশে ওপাশে আরও দু-চারজন উল্টোপাল্টা যাত্রী। দুটো মোটরগাড়ি, একটা স্কুটার। যাত্রা দলের পোষাক পরা তিন-চারজন নাবিক ইতস্তত চলাফেরা করছে।

স্টিমার যখন মধ্য নদীতে পৌঁছেছে, আমি বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া উপেক্ষা করে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। ঝোড়ো হাওয়ার উত্তাল হাহাকার, কালো আকাশের নিচে নদীর কালো জল। দূরে নগররেখা আলোকমালা প্রসাদচূড়া সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে মেঘ, বৃষ্টি ও অন্ধকারে। বিলীন হয়ে গেছে দেশ ও কালের সীমানা।

মনে হলো এই স্টিমার ভ্যাচের থেকে নিউ অরলিন্স যাচ্ছে না, এই নদী মিসিসিপি নয়। অনেক দূরের এক ছেলে এক দূরকালে বৃষ্টিতে মধ্যরাতে এই স্টিমার ঘরে ফেরা মানুষদের নিয়ে চলেছে সিরাজগঞ্জ থেকে পোড়াবাড়ি! স্টিমার থামলেই সামনে কাঁচা ঘাট, পানের দোকান, হিন্দু হোটেল। ছাতা আর লণ্ঠন নিয়ে পরিজনেরা অপেক্ষা করছে সেখানে।

নির্জন বনস্থলীর ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী আচাফালায়া নয়, ভূগোলের পৃষ্ঠার দীর্ঘতম নদী। মিসিসিপি নয় দূরে বহু-দূরে কোথাও তীরে তমালের ঘন ছায়া অনন্ত গোধূলি লগ্নে সেথা বহি চলে ধলেশ্বরী। এই অন্ধকার

রাতের স্টিমার কোনো দিন সেখানে পৌঁছাবে না। কোনো গ্রাম্য গায়কের ভাটিয়ালিতে সুর বেজে উঠবে না,

সুন্দরীতমা ধলেশ্বরী,

এবার সবাইকে কাছে ডাকো।

গলার মাফলার দিয়ে আমার বৃষ্টিভেজা মুখ মুছে নিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে গুঞ্জন করে বললাম,

'তোমার মতো তুমি থাকো ধলেশ্বরী।

তারপর একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে আরেকবার বললাম,

'তোমার মতো তুমিও থাকো

আচাফালায়া।'

খেলাচ্ছলে

পাঁচটা পেনাল্টি কিকের আয়োজন করছি। অবশ্য এ খেলায় কোন বিরোধী দল নেই, কিকদাতা এবং গোলরক্ষক আমি নিজেই। খুব নরম করে কিক করব এবং আমি নিজেই দৌড়ে গিয়ে গোল হওয়ার আগে বলটা ধরব। এতদসত্ত্বেও যদি কোন গোল হয়ে যায় তার জন্যে দায়ী হবে আমার স্থূল দেহ এবং জড়তা।

আমার প্রথম পেনাল্টি কিকটির জন্যে আমাকে খুব দৌড়োদৌড়ি করতে হয় নি। কারণ এটি আমার নিজেকে নিয়ে। কেন আমি রসিকতা করি—এই নিয়ে আমার এই মর্মান্তিক শট।

আগে গল্পটা বলে নিই। উত্তর কলকাতার এক ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডারটি ছিলেন সুরাদাস অর্থাৎ টানা মাতাল। সকাল নটা থেকেই কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক মদ্যপান শুরু করতেন। তবে ডাক্তারবাবুকে লুকিয়ে। ফার্মেসির ভিতরের ঘরে ওষুধপত্রের শিশি বোতলের মধ্যে তিনি দু চার বোতল দিশি মদ লুকিয়ে রাখতেন, ফুরিয়ে গেলে আবার নতুন বোতল নিয়ে এসে ডাক্তারবাবু আসার আগেই ফার্মেসির

মধ্যে আড়ালে রেখে দিতেন।

কাজ করতে করতে, ওষুধ—মিকশ্চার বানানর ফাঁকে ফাঁকে দু-চার ঢোক গিলে নিতেন কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক। তবে ডাক্তারবাবুকে সমীহ করতেন, ডাক্তারবাবু যেই ডাকতেন কোন প্রেসক্রুপশন দেয়ার জন্যে বা ইঞ্জেকশনের জন্যে, পকেট থেকে দুটো লবঙ্গ বের করে মুখে দিয়ে নিতেন, ডাক্তারবাবু যাতে কাছাকাছি গেলে মদের গন্ধটা না পান। গত পঁচিশ বছর ধরে এইরকম করে চালিয়ে আসছেন কম্পাউণ্ডারবাবু। কিন্তু আজকাল লবঙ্গের দর যা বেড়েছে তিনি আর কুলোতে পারছেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি এখন পকেটে করে কাঁচা পেঁয়াজ নিয়ে আসছেন। ডাক্তারবাবু ডাকলেই এক কামড় পেঁয়াজ চিবিয়ে যাচ্ছেন মদের গন্ধ আড়াল করার জন্যে।

প্রথমদিন ডাক্তারবাবু একটু ভুরু কোঁচকালেন। তাতে কম্পাউণ্ডারবাবু ভাবলেন, মুখে পেঁয়াজের গন্ধ পেয়েছে, সে যা হোক মদের গন্ধ ত টের পাচ্ছে না কিন্তু দ্বিতীয় দিন ডাক্তাববাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। দুপুরবেলা রোগী রোগিণী সব চলে যাওয়ার পরে ফার্মেসি বন্ধ করার মুখে ডাক্তারবাবু কম্পাউণ্ডার কে ডাকলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, দেখুন কম্পাউণ্ডারবাবু, আজ পঁচিশ বছর ধরে অনেক সহ্য করেছি, ভরদুপুরে দিশি মদ আর লবঙ্গের গন্ধ আপনার মুখ থেকে ভক ভক করে বেরিয়েছে। বহু কষ্টে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ দুদিন হল আপনার মুখ থেকে কাঁচা পেঁয়াজের সঙ্গে মদের গন্ধে নাড়ি উল্টে যাচ্ছে। বুড়ো বয়েসে আর নতুন কিছু সহ্য হবে না। মাসে গোটা কুড়ি টাকা এক্সট্রা নিন, লবঙ্গের যা দাম হোক লবঙ্গই খাবেন।'

বলা বাহুল্য ঐ একই কারণে আমি বোকা হাসি আর খেলো রসিকতা না করে পারি না। যদি লবঙ্গের বদলে পেঁয়াজ ধরি পাঠকেরাই চটে যাবেন। তবে কর্তৃপক্ষ হয়ত দু পয়সা বেশি দিতে পারেন লবঙ্গের জন্যে, কিন্তু সেটা খুব সম্মানজনক নয়।

বুদ্ধিমতী খেলাপাঠিকা, অয়ি ফুটবলরসিকা, জানি আপনি ঠোঁট টিপে হাসছেন, বুঝতে পারছেন আমার প্রথম শটটি আমি ইচ্ছে করেই

গোলপোস্টের উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি, ফলে এই মোটা শরীর নিয়ে গোল বাঁচানর পরিশ্রম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি।

আমার দ্বিতীয়, শটটি সংক্ষিপ্ত।

এ গল্পটি এক আধুনিক বাঙালী যশস্বী লেখককে নিয়ে। গল্পটি ত্রিকোণ প্রেমের। ত্রিকোণ প্রেমে কি থাকে? দুই পুরুষ আর এক মহিলা, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র। কিংবা দুই মহিলা আর এক পুরুষ, যেমন শরৎচন্দ্র। কিংবা মার্কিনী গে উপন্যাসে তিন পুরুষ; বড়জোর ফরাসী নীল কথিকায় তিন রমণী। কিন্তু আমাদের এই বাঙালী লেখকটি তেমন নন, তিনি স্ত্রৈণ। তাঁর ত্রিকোণ প্রেম হল একজন লেখক, তাঁর স্ত্রী এবং সর্বশেষ নিজেকে নিয়ে।

এই স্ত্রীর সূত্রেই আমি দ্রুত তৃতীয় শটে চলে যেতে চাই। কারণ সবাই বুঝতে পেরেছেন আমার পূর্বের শটটি গোলপোস্টে লেগে ফিরে এসেছে।

তবে, ভয়ে ভয়ে লিখছি, এবার এই তৃতীয়তে যা লিখছি সেটা আমার বক্তব্য নয়, আমার এক প্রিয় বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মহিলা হলেন আমার স্ত্রী। আর এটা যে শুধু আমার নিজেরই কথা তা নয়, আমার স্ত্রীও ঐ একই কথা বলেন।'

এখনও কোন গোল হয় নি। হবেও না। আর মাত্র দুটো কিক বাকি আছে। চেষ্টাত করতে হবে।

কিছুই মাথায় আসছে না। যাই রাস্তা থেকে এক পাক ঘুরে আসি।

ঘুরে এলাম। মোড়ের মাথায় একটা ভিখিরির সঙ্গে দেখা হল। নতুন ভিখিরি, আগে কখনও এ পাড়ায় দেখি নি। ভিখিরিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় রাখা আমার বহুদিনের অভ্যেস। এর সঙ্গেও আলাপ করতে গেলাম।

লোকটি দেখলাম চালাক। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাকে একটা টাকা দেব না দশটা পয়সা দেব?' সে বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'দিন একটা দশ পয়সা।' আমি বললাম 'এক টাকা নয় কেন?' সে

ম্লান হেসে বলল, 'এক টাকা ত আপনি দেবেন না। দশ পয়সা দিলেও দিতে পারেন।'

লোকটি বুদ্ধিমান, আমার চার নম্বর কিকটি সেই করে দিল।

সুতরাং এবার পঞ্চম বা অন্তিম শট, বোধ হয় বলা উচিত পারটিং কিক।

এটি একটি বিলিতি গল্প। এক সাহেবখোকা তার বয়েস ছয়-সাত হবে, সে তার বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ঘরের মধ্যে। বাবা দেয়ালে একটা ছবি টাঙ্গাচ্ছিলেন। শিশুসুলভ কৌতুহল নিয়ে সে বাবার মিস্তিরিগিরি পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ সে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে ছুটে গেল।

মেম মা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, কি হল। কান্নার কি হয়েছে?'

খোকা ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিল, 'দেয়ালে পেরেক গাঁথতে গিয়ে বাবার বাঁ হাতে বুড়ো আঙ্গুলে হাতুড়ি লেগে গেছে।'

মা হেসে বললেন, 'বোকা ছেলে, এই জন্যে কাঁদছ। বাবার কিছুই হয় নি। এটা দেখে তোমার হাসা উচিত ছিল।'

খোকা চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি ত হেসেই ছিলাম, আর তখনই বাবা আমাকে চড় মারল।,

শেষ প্রশ্ন :

কখনও অন্ধকার রাতে আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে আপনার কি মনে হয়েছে যে 'ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে ভগবান পৃথিবীর ফটোগ্রাফ তুলছেন?'

হে বন্ধু বিদায়

শেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকের তৃতীয়-অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ইয়াগোকে সেই যে ওথেলো বলেছিল,

Farewell ! Othello's occupation is gone.'

বিদায় ! ওথেলোর কাজ শেষ হয়েছে, সেই সুদীর্ঘ ফেয়ারওয়েল মালা আমার শুকনো কলমে নীরস অনুবাদ করে এই বিদায়বেলায় আমি কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। বরং গল্প বলি। যদি গল্পগুলিতে বিদায়ের সুর তেমন না বাজে, তার জন্যে আমি দায়ী নই। বিদায়-গ্রহণ নিয়ে রসিকতা সহজ নয়।

প্রথম দুটি কাহিনীই বড় মর্মান্তিক। দুটিই বিদায়দান সংক্রান্ত। প্রথমটি হল এক খবরের কাগজে এক গোলমেলে সাংবাদিককে বিদায় করা নিয়ে।

একদিকে সেই সাংবাদিকের যেমন ধারণা ছিল যে তাঁর মত কাউকে পাওয়া যাবে না, অন্যদিকে পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ একাধিক কারণে এই ভদ্রলোককে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সাংবাদিকটি যখন নিজেকে ভাবতে শুরু করেছেন যে পত্রিকাটি তাঁর জন্যেই চলছে, এই কাজের যা কিছু শ্রীবৃদ্ধি সে তাঁরই অবদান, তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি, যোগাযোগ বাস্তববোধ ভবিষ্যতবাণীর ক্ষমতা সে সব না হলে এই পত্রিকা চলবে না, অর্থাৎ এক কথায় ইংরেজীতে যাকে বলে ইনডিসপেনসেবল মানে অপরিহার্য ; সাংবাদিকটি যখন নিজেকে একশর মধ্যে একশ দশ নম্বর দিতে শুরু করেছেন এবং তাই শুধু নয় অন্যান্য সহকর্মীদের শূন্য কিংবা দশ বা পাঁচ দিচ্ছেন সেই সময় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, না খুব বেশি হয়ে গেছে আর নয়।

সাংবাদিক ভদ্রলোককে কর্তৃপক্ষ একদিন ডাকলেন, তারপর তিনি যে রকম নিজের সম্পর্কে ভাবছেন ঠিক তাই তাঁকে বললেন, 'দেখুন,

জানি না আপনাকে ছাড়া আমাদের কেমন করে চলবে, জানি না আপনি না থাকলে এই কাজের কি অবস্থা হবে, কিন্তু আমাদের সামনের সপ্তাহ থেকে সেই চেষ্টাই করতে হবে, আপনাকে বাদ দিয়ে কাগজ চলে কিনা দেখতে হবে। এই আপনার তিন মাসের মাইনে, গ্র্যাচুয়িটি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চেক। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ছাড়া আমাদের চলে কিনা দেখতে চাই।'

বিমূঢ়, বিহ্বল সাংবাদিকটির অবশ্যই কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু পরে তিনি সাবধান হয়েছিলেন, অন্যত্র যেখানে কাজ নিয়েছিলেন নিজেকে আর অপরিহার্য ভাবেন নি, ভাবলেও মনের ভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

দ্বিতীয় গল্পটি কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। এটি এক বিদায় অভিনন্দন সভা নিয়ে। এক বেসরকারি অফিসের বড়বাবু প্রায় চার-পাঁচবার দু-তিন বছর করে এক্সটেনসন পেয়ে অবশেষে সত্তর বছর বয়েসে চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন। সেই উপলক্ষে বিদায় সভা। অফিসের সমস্ত কর্মচারী, মায় বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব সবাই তাঁর থেকে বয়েসে ছোট। সবাই সভায় উপস্থিত।

বড়বাবু সত্যিসত্যিই চাকরি জীবনে যথেষ্ট কর্মদক্ষ এবং জনপ্রিয় ছিলেন। সভায় গান হল, 'জানি হলো যাবার আয়োজন, তবু পথিক থামো কিছুক্ষণ,' ওগো যেয়ো না, যেয়ো না,। তারপর প্রশস্তি পাঠ 'হে কর্মবীর তোমার বিহনে আমাদের অন্ধকার,' 'তুমি চলে গেলে এ অফিসের সর্বনাশ', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরপরে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সন্দেশ, চাদর, বেতের পাকা লাঠি (অবসর গ্রহণকালে লোকদের লাঠি উপহার দেওয়া রীতি কেন ?), উপহার দেওয়া হল বড়বাবুকে। কর্তৃপক্ষ দিলেন একটি কাঁসার থালা এবং ন্যায্য পাওনার উপরে দশ হাজার এক টাকার একটি চেক।

এরপরে মাননীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই কোম্পানির বড়সাহেবের বক্তৃতা। বড় সাহেব বললেন, যে এরকম বড়বাবু তারা আর কখনও পাবেন না। দশ বছর তাঁরা বড়বাবুকে অবসরের পরেও আটকে

রেখেছিলেন। তিনি এখন চলে যাচ্ছেন, কি করে অফিস চলবে কে জানে।

আগের গল্পে সাংবাদিক ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন, এখানে বড়বাবুর বিষয়ে বড় সাহেব ঠিক সেই সব কথাই বললেন। মোদ্দাকথা বড়বাবু ছিলেন ইনডিসপেনসিবল, এখানে তাঁকে বাদ দিয়ে কি করে চলবে কে জানে?

সর্বশেষে স্বয়ং বড়বাবু বিদায় অভিভাষণ দিতে উঠলেন। সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিনি নিজের গলার ফুলের মালা বড় সাহেবের গলায় পরিয়ে দিলেন, দশ হাজার এক টাকার চেকটিও তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে দিলেন। তারপর কর্মচারী সমিতিকে লাঠি, চাদর, সন্দেশ সব ফেরত দিয়ে দিলেন। অবশেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি আমাকে ছাড়া এ অফিস চলবে না। আমার আগেই বিশ্বাস ছিল এখন আপনাদের সকলের বক্তৃতা শুনে জানলাম, বুঝলাম যে আমি কতটা অপরিহার্য। আমি রিটায়ার করছি না। আমি আবার কাল থেকে অফিসে আসছি।

পুনশ্চ : তারাপদ রায়ের লেখাপড়া বা জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা যথেষ্ট পেয়েছেন। এবার বিদায়বেলায় ইংরেজী কেতায় বলে আপনাদের ঘরে ফিরিয়ে দিচ্ছি, দুইটি সরল, সোজা প্রশ্ন রাখছি আপনাদের কাছে। যদি উত্তর দিতে পারেন জীবনে আর কোন দিন মুর্খের লেখা পড়বেন না। কারণ কোনটারই উত্তর সে জানে না।

প্রশ্নত্রয়:

(ক) কেউ যদি তার বিধবা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে সেটা কি বেআইনী হবে?

(খ) কলকাতার আদালতগুলিতে প্রতি মাসে যদি আটশ চুয়াল্লিশ জন (৮৪৪) স্বামী আটশ চুয়াল্লিশ জন স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনে থাকে, তবে আটলক্ষ চল্লিশ হাজার চারশ জন স্বামী কতজন স্ত্রীর বিরুদ্ধে কত দিনে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনবে?